চেকপোস্ট

নিমাই ভট্টাচার্য

চেকপোস্ট

নিমাই ভট্টাচার্য

করুণা প্রকাশনী/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৫৮

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ, বিধান সরণি
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

এক

সত্যি কথা বলতে কি এখানে টু পাইস উপরি আয় আছে ঠিকই কিন্তু বড্ড ঝামেলার কাজ। কখন যে কি ঘটে যায় তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। তাই সব সময় টেনশনে থাকতে হয়। কথাগুলো বলে একটু শুকনো হাসি হাসে সামন্ত। আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। বোধহয় আমার কাছে সমর্থন বা সমবেদনা চায়।

এত বছর পর ওর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা। একেবারেই অভাবিত। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি হরিদাসপুর চেকপোস্টে ওর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু সে যাই হোক ও নির্বিবাদে আমার সঙ্গে কথাগুলো বলল। আমি একটু অবাকই হলাম। তবু ভাল লাগল।

ঘরের বাইরে দরজার মাথায় কাঠের ফলকে লেখা আছে এন. সি. সামন্ত অফিসার ইন চার্জ, ইমিগ্রেশান চেকপোস্ট, হরিদাসপুর। এপার-ওপারের কাস্টমস ও চেকপোস্টের কর্মী অফিসারদের কাছে ও সামন্ত বলেই পরিচিত। সাধারণ যাত্রীদের কাছে ও ও-সি সাহেব, ছোট-বড়-মাঝারি দালালরা ওকে বড়বাবু বলে। কেউ কেউ হয়ত ওর একটা নোংরা নামও দিয়েছে এবং তা খুবই স্বাভাবিক। বহু পুলিস অফিসারের অদৃষ্টেই এই বিশেষ নামকরণের সৌভাগ্য জুটে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের শত নামের মত পুলিস অফিসারদের খ্যাতি-অখ্যাতি অনুসারে নানা নামকরণ হয়, তা আমি জানি।

দমদম থেকে উড়োজাহাজে উড়ে গেলে ঢাকা মাত্র আধঘণ্টার পথ। প্যান-অ্যাম, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, এয়ার ইণ্ডিয়া বা জাপান এয়ার লাইন্সের বিমানে লণ্ডন-নিউইয়র্ক মস্কো-প্যারিস হংকং-টোকিও যাত্রার মত বিমানে ঢাকা যাত্রায় আভিজাত্যও নেই, উত্তেজনাও নেই। শুধু তাই নয়। বিমানবন্দরে আত্মীয় বন্ধুদের উপস্থিতি, পুষ্প স্তবক

প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি আসন্ন বিদায়-ব্যথায় কাতর হয়ে প্রেয়সীর ছু'ফোটা চোখের জলও দেখার সৌভাগ্য হবে না বলেই বিমানে ঢাকা গেলাম না।

আমি একাই যাচ্ছি কিন্তু ঠিক নিঃসঙ্গ নই। বনগাঁ লোক্যালের কামরাতেই কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। শিয়ালদ' থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় এত ভীড় ছিল যে মনে হলো, এবার বোধহয় কুম্ভমেলা বনগাঁতেই হবে। এই ভীড়ের মধ্যে মাত্র বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি সম্বল করে টিকে থাকতে পারব কিনা এই ছুশ্চিন্তাতেই বিব্রত ছিলাম। প্রায় অর্ধেক রাস্তা পাড়ি দেবার পর মনে হলো, বোধহয় বৈতরণী পার হতে পারব। একটা সিগারেট ধরিয়ে আশেপাশের যাত্রীদের দেখতেই বুঝলাম, এই কামরাতেই আমারই মত আরো ছু'চারজন বিদেশযাত্রী বনগাঁ চলেছেন। উপযাচক হয়ে আমার আলাপ করতে হলো না। ব্যাগ থেকে পত্রপত্রিকাগুলো বের করতেই সামনের ভদ্রলোক বললেন, তাড়াহুড়োর মধ্যে শিয়ালদ'তে কাগজ কিনতে পারিনি। আপনার একটা কাগজ দেখতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কথাগুলো বলতে বলতেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ইনি লোক্যাল ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী না। অতিরিক্ত লড়াই করার জন্য লোক্যাল ট্রেনের নিত্য যাত্রীদের মুখে যে রুক্ষতা ও ক্লান্তির ছাপ থাকে, তা ওঁর নেই। যাই হোক পত্রপত্রিকাগুলো ওঁর সামনে এগিয়ে ধরতেই উনি সেদিনের ইকনমিক টাইমস্ তুলে নিলেন। আমি একটু হেসে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই ইকনমিক্সের অধ্যাপক অথবা কোন চেম্বার অব কমার্সের সঙ্গে···

কথাটা শেষ করার আগেই উনি হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, আপনি দেখছি কিরীটি রায়!

আমিও হাসি। বলি, আমি একজন তুচ্ছ সাংবাদিক মাত্র। তাই বলুন। আমি অধ্যাপনা করি।

উনি মাঝারি সাইজের একটা ভি-আই-পি স্যুটকেস থেকে রিডিং গ্লাস বের করতেই আমি একটু হেসে বললাম, মনে হচ্ছে আপনিও আমারই মত বিদেশযাত্রী।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন, ভি-আই-পি স্যুটকেস দেখেই ধরে ফেলেছেন ?

আমি শুধু হাসি।

—হ্যাঁ, একটা সেমিনারে জয়েন করতে ঢাকা যাচ্ছি। একটু থেমে বললেন, আমার মামারা খুলনায় আছেন। তাই যাতায়াতের পথে খুলনায় ক'দিন কাটাব বলে এই পথে চলেছি।

—ও !

আমারই বেঞ্চের একটু ওপাশ থেকে হঠাৎ এক নারীকণ্ঠ শুনি, শুধু আপনারা না, আমিও পাসপোর্ট-ভিসা সম্বল করে এই লোক্যালে চড়েছি।

আমি ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বলি, তাহলে নারীভূমিকা বর্জিত নাটক নয়।

কথাটা বলেই ভীষণ লজ্জিতবোধ করলাম। ভাবলাম, বোধহয় অন্যায়ও হলো। হাজার হোক উনি যুবতী, এবং সুন্দরী। সুদর্শন যুবকদের চাইতে সুন্দরী যুবতীরা নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক সচেতন হন। এবং অহংকারী। ওঁরা মনে মনে আশা করেন, এ বিশ্ব-সংসারের সব পুরুষই ওঁদের রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবেন এবং আরো কত কি ! কিন্তু রূপ-সৌন্দর্যের তারিফ করা তো দূরের কথা, কোন পুরুষ কোন কারণে দু' একটা কথাবার্তা বললেও সুন্দরী যুবতীরা অসন্তুষ্ট না হলেও অন্তত বিরক্তবোধ করেন। কথাটা নেহাতই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলেও মুহূর্তের জন্য ভয় হলো, হয়ত উনি একটা বিরূপ মন্তব্য করবেন ; অথবা আমাকে উপেক্ষা করে অপমানিত করবেন।

না, তেমন কিছু ঘটল না। জয়ন্তী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, শুধু নাটকে না, জীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমাদের না হলে আপনাদের চলে না।

পাশ থেকে মাসীমা বললেন, ঠিক বলেছ মা।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতেই বললেন, কোন পুরুষ কী কখনও বলেছে যে তাদের জীবনে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই ?

আমি জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হেসে বললাম, যাক, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করে বেশ সময়টা কেটে যাবে।

উনি হাসতে হাসতেই বললেন, শুধু কাজকর্মে না, ঝগড়াঝাটির ব্যাপারেও মেয়েদের খ্যাতি অনেক খ্যাতি।

ওঁর কথায় আমরা সবাই হাসি।

বনগাঁ পৌঁছবার আগেই আমাদের ক'জনের মধ্যে বেশ আলাপ-পরিচয় জমে উঠল। পার্ক সার্কাসের মাসীমা বললেন, বড্ড ভয়ে ভয়ে রওনা হয়েছিলাম। এখন আপনাদের পেয়ে একটু ভরসা পাচ্ছি।

আমি হেসে বলি, আপনি তো আচ্ছা লোক মাসীমা! আমাদের এতজনকে পেয়েও আপনার একটু মাত্র ভরসা হচ্ছে ?

উনি লজ্জিত হয়ে বললেন, না, না, বাবা, তা না। সেই দেশ ছাড়ার পর তো আর যাই নি, তাই মনে মনে বড্ড ভয় ছিল। তাছাড়া আমরা দুই বুড়োবুড়ি যাচ্ছি তো···

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথায় যাবেন ?

মাসীমা আর মেসোমশাই প্রায় একসঙ্গে বললেন, আমরা যাব বরিশাল।

—খুলনা থেকে স্টীমারে যাবেন তো ?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনাদের স্টীমারে চড়িয়ে দেব।

মাসীমা বোধহয় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করেই বললেন যাক, তাহলে আর চিন্তা কী? বরিশালে তো মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনীরা স্টীমার ঘাটে থাকবে।

এবার জয়ন্তী ওঁদের জিজ্ঞেস করলেন, বরিশালে বেড়াতে যাচ্ছেন?

মাসীমা একটু হেসে বললেন, মেজ নাতনীর বিয়ে।
বড় নাতির বিয়েও মাস দেড়েকের মধ্যে হতে পারে। তাই···

আমাদের নেমন্তন্ন করবেন না? জয়ন্তী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন।

—চলো না মা, তোমরা সব্বাই চলো। তোমরা সবাই গেলে ওরা খুব খুশি হবে। মাসীমা একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, আমার জামাইবাড়ির উপর লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনেরই কৃপা আছে। তোমরা গেলে ওদের কোন অসুবিধা হবে না।

পত্রপত্রিকাগুলো বের করলেও পড়া হয় না কারুরই। আমরা সবাই গল্পগুজবে মেতে থাকি। গল্পগুজব মানে নিজেদের আলাপ-পরিচয়ই একটু ভালভাবে হয়। মেসোমশাই রেলের ডি. এস. হয়ে রিটায়ার করেছেন অনেকদিন আগে। কর্মজীবনে বহু বছর কাটিয়েছেন পূর্ববাংলায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাতেই অধিকাংশ সময় থাকলেও কয়েক বছর রংপুরেও ছিলেন। সব ছেলেমেয়েদের জন্মই ওদিকে। দু'মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন ঐদিকেই। বড় মেয়ে বরিশালে থাকে, মেজ মেয়েটি আছে ঢাকায়। বাকী সব এদিকে। বেশ সুখের সংসার ছিল কিন্তু গত বছর মেজ জামাইটির হঠাৎ ক্যান্সার ধরা পড়ার পর মাস তিনেকও বাঁচল না। মাসীমা পাঁজর কাঁপানো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেশী দিন বেঁচে থাকলে কপালে এসব দুঃখ থাকবেই। আবার কোনমতে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, কপালে আরো কত দুঃখ আছে, তা ঠাকুরই জানেন।

জয়ন্তী বললেন, ওকথা বলছেন কেন মাসীমা? অল্প বয়সে কি মানুষ দুঃখ পায় না?

পায় বৈকি মা! কিন্তু যত বেশী দিন বাঁচা যাবে, তত বেশী কষ্ট পেতে হবে।

আমি চুপ করে শুনি। আমি মাসীমা-মেসোমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওঁদের বুকের ক্ষতের আন্দাজ করি।

জয়ন্তী একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, মাসীমা, সুখ-দুঃখ বোঝার কি কোন বয়স আছে?

এতক্ষণ নীরব থাকার পর মেসোমশাই বললেন, ঠিক বলেছ!

বনগাঁ লোক্যাল এগিয়ে চলে। হকারের স্রোতে ভাটার টান হয়। আমি আর অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সিগারেট ধরাই।

একটা স্টেশন আরো পার হয়। এবার মাসীমা জয়ন্তীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাবে মা?

—আমি এখন রংপুর যাব।

—ওখানে তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন আছেন?

—আমার বাবা ওখানেই থাকেন। এখন মা'ও ওখানে আছেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—তুমি কলকাতায় থাকো?

—আমরা তিন ভাইবোন আর মা কলকাতায় থাকি।

মাসীমা আবার প্রশ্ন করেন, বাবা মাঝে মাঝে আসেন?

—কোর্ট বন্ধ থাকলেই বাবা কলকাতায় চলে আসেন।

—উনি একলা একলাই ওখানে থাকেন?

—না, না, আমার দুই কাকাও ওখানে আছেন। তাছাড়া মা মাঝে মাঝেই যান।

ওঁরা কথা বলেন। আমরাও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা

বলি। হঠাৎ একবার কানে এলো মাসীমার কথা, স্কুলে পড়ান ভাল কাজ কিন্তু বিয়ে করবে কবে ?

ইচ্ছা করল জয়ন্তীর দিকে তাকাই কিন্তু দ্বিধা হলো। লজ্জা করল। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তীর উত্তর শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

উনি জবাব দিলেন, সবাই কী বিয়ে করে ?

ছেলেরা বিয়ে না করেও থাকতে পারে কিন্তু মেয়েদের কী তা সম্ভব ?

বনগাঁ পৌঁছবার দশ-পনের মিনিট আগে আমি মাসীমাকে জিজ্ঞেস করি, কী মাসীমা, কেমন লাগছে ?

মাসীমা খুশির হাসি হেসে বললেন, তোমাদের মত ভাল ছেলেমেয়ে পাবার পরও কী খারাপ থাকতে পারি ?

তাই বলুন। আমি হাসি চেপে বলি, বিশেষ করে আমার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

আমার কথায় শুধু ওঁরা না, আরো দু'একজন হাসেন। হাসি থামলে তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে জয়ন্তী বলেন, সব চাইতে আমি ভাল, তাই না মাসীমা ?

জয়ন্তীর প্রশ্ন শেষ হতে না হতেই ট্রেন বনগাঁ স্টেশনে ঢোকে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মাসীমাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই বলেন, আমার মত ভাল মানুষ হয় না, তাই না মাসীমা ?

এতক্ষণ নীরব থাকার পর মেসোমশাই বলেন, তোমাদের মাসীমার কাছে তোমরা কেউই ভাল না, শুধু আমি ভাল।

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠি।

দুই

ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ও-সি সাহেবের নাম যাত্রীসাধারণের অবগতির জন্য কাঠের ফলকে অত সুন্দর করে লেখা থাকলেও আমার

নজরই পড়েনি। ও-সি সাহেবের নাম জানার প্রয়োজনও বোধ করিনি। দারোগাবাবুরা কে কোথায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, তা জানতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। চেকপোস্টের বড় দারোগাবাবু সম্পর্কে আমার সামান্যতম আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না বলেই বোধহয় অমন করে জড়িয়ে পড়লাম।

ভাগ্যবিধাতা সত্যি বড় রসিক। এ সংসারে কাছের মানষই দূরে যায়, দূরের মানুষই আপন হয়। একদিন যাকে তুচ্ছ মনে হয়, যাকে অবজ্ঞা করি, সম্মান দিতে চাই না, সেই মানুষটাই একদিন মনের মন্দিরের পরম প্রিয় বিগ্রহ হয়ে ওঠেন। শুধু কী ব্যক্তির জীবনে?। জাতির জীবনে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর অসংখ্য নজীর ছড়িয়ে আছে।

বনগাঁ লোক্যালের অসংখ্য অপরিচিত মানুষের ভীড়ের মধ্যে থেকেও যারা হঠাৎ আমার প্রিয়জন না হলেও পরিচিত হয়েছেন, তারা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি ওদের সবার পাসপোর্ট হাতে নিয়ে ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় হঠাৎ এক দারোগাবাবু আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, আরে বাচ্চু! তুমি?

অতীতে ছাত্রজীবনে আমি যে নিত্যচরণ সামন্তকে চিনতাম ও আজকের এন. সি. সামন্তর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। নিত্যচরণ আগে ছিল রোগা, আজকের এন. সি. মোটা, অতীতে যার মাথাভর্তি চুল সব সময় বিশুদ্ধ সরিষার তৈলে তৈলাক্ত থাকত, এখন সে মাথায় তবলা বাজান যায়। নিত্য কলেজে পড়ার সময়ও শুধু শার্টের গলার বোতামটি বন্ধ করত না, ধুতির কোঁচাটি পর্যন্ত মাটি থেকে কয়েক ইঞ্চি উপর পর্যন্ত ঝুলে থাকত, সেই মানুষটি আজ দারোগাবাবুর পোশাকে সজ্জিত। সর্বোপরি সেদিনের সেই পাঁশকুড়া-মেচেদা লোক্যালের যাত্রী নিত্যর চোখে-মুখে যে অবিশ্বাস্য গ্রামীণ সারল্যের ছবি ফুটে

উঠত, তা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। আজকের বড়বাবুর চোখে-মুখে শিকারীর সুপ্ত হিংস্রতা ও ক্রূরতার চাপা ইঙ্গিত। তাই তো আমি ওকে চিনতে পারি না। অবাক হয়ে দারোগাবাবুর দিকে তাকাই।

না, দারোগাবাবু আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না। একটু এগিয়ে এসেই হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আরে ভাই, আমি নিত্য! নিত্যচরণ সামন্ত।

এবার উনি দু'হাত দিয়ে আমার দু'হাত ধরে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, এবার মনে পড়ছে?

আমি প্রায় ভূত দেখার মত কোনমতে বিড়বিড় করে বলি, তুমি নিত্য! সেই মেচেদা-পাঁশকুড়া··

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেই নিত্য।

—তুমি দারোগা হয়েছ?

—দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না?

এবার আমি প্রায় স্বাভাবিক হয়ে বলি, আগে তো চোরেরাই তোমাকে মারধর করতো; আর এখন তুমি চোর-ডাকাত ধরো?

আমার এ কথার জবাব না দিয়ে ও আমাকে টানতে টানতে ওর পাশের চেয়ারে বসিয়েই হুঙ্কার দিল, এই জগদীশ! নগেন! আর হাওয়া না খেয়ে একটু শুনে যাও।

বড়বাবুর হুঙ্কার শুনে প্রায় নেকড়ে বাঘের মত লাফ দিয়ে একজন কঙ্কালসার কনস্টেবল বলল, হ্যাঁ সার!

চোখ দুটো গোল গোল করে বেশ ধমক দেবার সুরেই নিত্য বলল, তোমরা সব কে কোথায় থাকো? দয়া করে একটু মিষ্টি-টিষ্টি আর স্পেশাল চা আনো। দেখছ না আমার ছাত্রজীবনের বন্ধু এসেছেন?

আমি কনস্টেবলটিকে কিছু বলার আগেই সে আগের মতই এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হাতের পাসপোর্টগুলো দেখিয়ে এবার আমি নিত্যকে বলি, ভাই, আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন—

হাজার হোক দারোগাবাবু। ওরা বুঝি হাঁ করলেই হাওড়া বোঝেন। আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ও চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে গিয়ে আমাকে বলল, কই, তোমার ফ্যামিলির সব কোথায় ?

ওঁরা সবাই একটু পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমি এগিয়ে ওদের কাছে যেতেই নিত্য ঢিপ ঢিপ করে পার্ক সার্কাসের মাসীমা-মেসোমশাইকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বলল, আমি আর বাচ্চু একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি।

মাসীমা-মেসোমশাই হতবাক হয়ে ও-সি সাহেবের দিকে তাকাতেই নিত্য একবার সবাইকে দেখে নিয়েই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে নমস্কার করে বলল, আমি আপনার ভাইয়ের ক্লাস-ফ্রেণ্ড !

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ও দারোগাবাবুর কাণ্ড দেখে অবাক কিন্তু এবারও উনি কিছু বলার আগেই জয়ন্তীকে নমস্কার জানিয়েই নিত্য একটু হেসে বলল, আপনি নিশ্চয়ই আমার বন্ধুপত্নী !

এ যেন এস্‌প্লানেড ইস্টে পুলিস অ্যাকশান ! সব পুলিস সবাইকে লাঠিপেটা না করা পর্যন্ত থামতে জানে না, থামতে পারে না।

আমি লজ্জায় বিস্ময়ে নির্বাক। বড়বাবুর সম্মানিত অতিথি হিসাবে সবাই ঘরে এসে বসার পর অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একটু হেসে বললেন, আমরা কেউই কারুর আত্মীয় না। বনগাঁ লোক্যালে আলাপ। আমাদের একমাত্র মিল আমরা সব বাংলাদেশ যাচ্ছি।

নিত্য অধ্যাপকের বিবৃতির কোন গুরুত্ব না দিয়েই সন্ন্যাসীর ঔদার্য দেখিয়ে মাসীমাকে বলল, আপনি বাচ্চুর মা না হয় মায়ের মত তো !

—সে তো একশ' বার !

শুধু মাসীমাকেই তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে নিত্য ক্ষান্ত হয় না; অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে বলে, আপনিও আমাদের ভাইয়ের মত ! মুহূর্তের জন্য চোখের দৃষ্টি জয়ন্তীর দিক থেকে ঘুরিয়ে এনেই বলল, আর উনি এখন না হলেও ভবিষ্যতে আমার বন্ধুপত্নী—

—আঃ ! নিত্য !

ইতিমধ্যে চা মিষ্টি এসে যায়। নিত্য প্রায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত মাসীমাকে বলে, নিন মাসীমা, একটু মিষ্টি খেয়ে যান।

—এই একটু মিষ্টি বাবা !

মাসীমার কথা বোধহয় ওর কানেও ঢুকল না; অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ও জয়ন্তীকে বলল, দাদা, একটু মুখে দিন। একটু মিষ্টি মুখ করে চা খান।

জয়ন্তী বললেন, এর সিকি ভাগ মিষ্টিও আমি খেতে পারব না।

ও সি সাহেব মাথা নেড়ে বলল, এ হতচ্ছাড়া জায়গায় তো ভাল দোকান বা হোটেল নেই যে আপনাদের ভালমন্দ দেব। যা সামান্য জিনিস দেওয়া হয়েছে, তাতে আর অমন করে লজ্জা দেবেন না।

যাই হোক, আমরা চা-জলখাবার খেতে খেতেই আমাদের পাসপোর্টগুলোয় ছাপ দিয়ে দিলেন ছোট দারোগাবাবু। আমরা বসে বসে টুকটাক কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় বাংলাদেশ পুলিসের একজন সিপাই এসে নিত্যকে সেলাম করে একটা ছোট কাগজ দিয়ে বলল, ও সি সাহেব এটা পাঠিয়ে দিলেন।

কাগজের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়েই নিত্য একটু গলা চড়িয়ে এ-এস-আইকে বললেন, জগন্নাথবাবু, প্রশান্ত মুখার্জী নামে কেউ এলে বলবেন—

নিত্যকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একটু উত্তেজিত হয়েই বললেন, আমার নাম প্রশান্ত মুখার্জী।

নিত্য একটু হেসে বলল, ও ! আপনি খুলনায় যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—খুলনা থেকে আপনার আত্মীয় গাড়ি নিয়ে ওপারে অপেক্ষা করছেন।

—তাই নাকি ! অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যেন আশাই করেন নি।

গাড়ি আসার খবর শুনেই যেন মাসীমা হতাশ হলেন। বললেন, আপনি তো গাড়িতে চলে যাচ্ছেন। আমাদের বোধহয় স্টীমারে চড়িয়ে দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না?

—না, না, তা কেন হবে না? তাছাড়া গাড়ি যখন এসেছে, তখন আপনাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব।

মেসোমশাই বললেন, কিন্তু গাড়িতে কী জায়গা হবে?

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, একজনের বেশী নিশ্চয়ই আসে নি। সুতরাং জায়গা না হবার কী আছে?

ওদের কথা শুনেই নিত্য অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়কে বলল, আপনি বরং একবার দেখে আসুন। ওকে এই কথা বলেই একজন কনস্টেবলকে বলল, নগেন, তুমি প্রফেসার সাহেবকে ওপারের ও-সি সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। আর বলবে, উনি ওঁর গাড়িটা দেখে ফিরে আসবেন।

দশ-পনের মিনিট পরই অধ্যাপক ফিরে এসে খুশির হাসি হেসে বললেন, অনেক দিন পর যাচ্ছি বলে আমার ছোট মামা আর দুই মামাতো ভাই আমাকে নিতে এসেছেন। এবার উনি মাসীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যে গাড়ি এসেছে, তাতে আমরা তিনজন ধরে যাব বলেই মনে হয়।

মেসোমশাই বললেন, আমরা গেলে বোধহয় আপনাদের সবাইকেই কষ্ট দেওয়া হবে।

—কষ্ট আবার কী! মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের তো পথ।

জয়ন্তী বললেন, বনগাঁ লোক্যালের চাইতে বেশী কষ্ট কী হবে?

ওর কথায় আমরা হাসি।

এবার নিত্য ওদের তিনজনের পাসপোর্ট কনস্টেবল নগেনের হাতে দিয়ে বলল, এদের তিনজনকে পৌঁছে দিয়ে এসো, আর বলো, এরা আমার লোক।

জয়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমিও যাই।

নিত্য বলল, আরে দাঁড়ান দাঁড়ান। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? জলে তো পড়েন নি।

—কিন্তু…

—কিছু কিন্তু করার কারণ নেই। বসুন বসুন।

আমি বললাম, নিত্য, আমি ওদের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে আসতে পারি?

—কেন পারবে না? নিত্য সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো, আমিও যাই।

আমরা দুজনে পা বাড়াতেই জয়ন্তী বললেন, আমিও কী ওদের সী-অফ করতে যেতে পারি?

নিত্য এক গাল হাসি হেসে বলল, অধিকন্তু ন দোষায়।

হাজার হোক ও-সি সাহেব নিজে এসেছেন। নিমেষে কাস্টমস-এর বৈতরণী পার হলো এদিকে—ওদিকে। ওদিকের ও-সিও ছুটে এলেন কাস্টমস কাউণ্টারে। নিত্যর সামনে এসে উনি বললেন, নগেন এলেই তো হতো। আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন? তারপর ও-সি মহীউদ্দীন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আপনি কী ভাবলেন, আপনার বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়-স্বজনকে আমরা হ্যারাস করব?

নিত্য হাসতে হাসতে বলল, আপনাদের আত্মীয়-স্বজনকে যখন আমরা হ্যারাস করি, তখন আপনারাও…

ওদের কথা শুনে কাস্টমস-এর তিন-চারজন ইন্সপেক্টর হো-হো করে হেসে উঠলেন।

হাসি থামলে নিত্য একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার বৌমার তেল ফুরোবার আগেই আমাকে বলো।

ঐ ইন্সপেক্টর কিছু বলার আগেই অন্য একজন ইন্সপেক্টর নিত্যকে

বললেন, স্যার, ইসাক নতুন বিয়ে করেছে বলেই ওর বউ জবাকুসুম মাখবে আর আমি দু'বছর আগে ঘরে বউ এনেছি বলে···

নিত্য ঘাড় ঘুরিয়ে ডান দিকে তাকিয়ে বলল, শুনছ ইসাক তোমার বন্ধু কী বলছে ? যে ছোট ভাই বিয়ের সময় বড় ভাইকে নেমন্তন্ন করতে ভুলে যায়, তার কী শাস্তি হওয়া উচিত ?

এবারও ইসাক কিছু বলার আগেই ডানদিকের কোণা থেকে কাস্টমস-এর একজন মহিলা কর্মী মন্তব্য করলেন, পর পর সাত দিন পদ্মার ইলিশ খাওয়ানো।

মহা খুশি হয়ে নিত্য বলল, ঠিক বলেছেন আপা।

মাসীমা-মেসোমশাই, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়, জয়ন্তী ও আমি অবাক হয়ে ওদের হাসাহাসি কথাবার্তা শুনছিলাম। এবার অধ্যাপক, মুখোপাধ্যায় দু'দিকের দুই ও-সিকে বললেন, আপনাদের মধ্যে যে এত ভাল সম্পর্ক তাতো আমরা ভাবতেও পারি না।

জয়ন্তী বললেন, সত্যিই তাই।

নিত্য কিছু বলার আগেই ওপারের ও.সি. বললেন, এই বর্ডারের পোস্টিং-এ যে কি ঝামেলা আর টেনশন, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না। আমাদের সম্পর্ক ভাল না হলে তো আমরা কাজই করতে পারব না।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বললেন, তা ঠিক।

কাস্টমস-এর ঘর থেকে বেরুবার আগে নিত্য একটু চিৎকার করেই বলল, ইসাক, তোমার বন্ধুকে বলে দিও পদ্মার ইলিশ না খাওয়ালেও এবার থেকে ঠিক জায়গায় ঠিক সময় জবাকুসুম নিয়মিত পৌঁছে যাবে।

ঐ তরুণ ইন্সপেক্টরটিও সবাইকে শুনিয়ে বলে, ইসাক, তুইও তোর দাদাকে জানিয়ে দে, জবাকুসুম মেখে আমার বউয়ের মাথা ঠাণ্ডা থাকলে দাদা তার এই অধম ভাইয়েরই উপকার করবেন।

ওর কথায় ঘরের সবাই হেসে ওঠেন।

পার্ক সার্কাসের মাসীমা-মেসোমশাই ও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বিদায় সম্বর্ধনা ভালই হলো। মেসোমশাই ছু'দিকের ছুই ও-সিকেই বার বার ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, বর্ডার পার হওয়া নিয়ে সত্যি ভয় ছিল এবং এই ভয়ের জন্যই পার্টিশন হবার পর আর এদিকে আসিনি।

মেসোমশাই একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, এখন আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতে পারি।

বেনাপোলের ও-সি বললেন, একশ' বার আসবেন। আপনাদের আসা-যাওয়ার জন্যই তো আমরা আছি। এবার উনি মাসীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যখন ইচ্ছে নাতি-নাতনীর কাছে যাবেন। কোন অসুবিধা হবে না।

—হ্যাঁ বাবা, সত্যি আবার আসব।

গাড়িতে ওঠার আগে মাসীমা জয়ন্তীকে বুকের মধ্যে মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, সাবধানে যেও। আর এই মাসীমাকে ভুলে যেও না। আমরা কলকাতা ফিরে এলে মাঝে মাঝে চলে এসো। খুব খুশি হবো।

—আসব মাসীমা।

মাসীমা আমার মাথায় মুখে দশ বার হাত ঝুলাতে ঝুলাতে বলেন, তোমাকে আর কী বলল বাবা! তুমি না থাকলে আমার এইসব ছেলেদের সঙ্গে আলাপই হতো না। তুমিও মাঝে মাঝে দেখা করো।

বললাম, হ্যাঁ মাসীমা, নিশ্চয়ই দেখা করব।

নিত্য বলল, মাসীমা, আমিও আসব।

—একশ' বার আসবেন। ছেলেমেয়েরা যদি মা-মাসীকে বিরক্ত না করে তাহলে কী মা-মাসী শান্তিতে থাকতে পারে?

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ও সবাইকে বার বার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

ওদের গাড়ি রওনা হবার পর এপারের দিকে ছু'এক পা গিয়েই

জয়ন্তী আমাকে বললেন, মাত্র এই ক'ঘণ্টার পরিচয় কিন্তু তবু ওরা চলে যাওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, মানুষের মন নিয়ে এই ত বিপদ। সে যে মুহূর্তের মধ্যে কখন কাকে ভালবাসবে, তা কেউ বলতে পারে না।

জয়ন্তী একবার আমার দিকে তাকালেন। বোধহয় একটু হাসলেনও।

নিত্য বোধহয় একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, এখানে যে কত মানুষের কত কি দেখলাম আর জানলাম, তা ভেবেও অবাক হয়ে যাই।

তিন

নিত্য কোন কালেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল না, ছিল সহপাঠী। কলেজে আমার অসংখ্য বন্ধু ছিল। অধ্যাপকদের সঙ্গেও আমার হৃদ্যতা ছিল। পড়াশুনা ছাড়াও আরো বহু বিষয় নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকতাম। আর নিত্য? সে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রামে তিন পয়সার টিকিট কেটে কলেজে আসত, ক্লাস করত, আবার তিন পয়সায় হাওড়া পৌঁছে পাঁশকুড়া লোক্যালে চড়ে বাড়ি ফিরে যেত। এই ছিল ওর নিত্যকর্ম পদ্ধতি।

কলেজের পাশেই ছিল ছবিঘর আর পূরবী। আমরা মাঝে মাঝে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এর-ওর কাছ থেকে পয়সাকড়ি ধার করেও সিনেমা বা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের খেলা দেখেছি কিন্তু নিত্য নৈব নৈব চ।

শুধু কী তাই? নিত্য কোনদিন আমাদের সঙ্গে বসে কেষ্ট কাফেতে এক কাপ চা পর্যন্ত খায় নি। তবু সেই নিত্যকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের হরিদাসপুর চেকপোস্টে ও-সি দেখে কত ভাল লাগল আমাকে পেয়ে ও নিজেও কত খুশি হলো।

এ সংসারে জীবনের সব ক্ষেত্রেই এমন হয়। বিয়ের আগে মেয়েরা যে ভাইয়ের সঙ্গে নিত্য ঝগড়া করেছে, বিয়ের পর দীর্ঘদিনের ব্যবধানে সেই ভাইকে কাছে পেয়েই মেয়েরা যেন হাতে স্বর্গ পায়। আসল কথা, পুরানো দিনের ছিটেফোঁটা স্মৃতিও বর্তমানের অনেক মধুর অভিজ্ঞতার চাইতেও মানুষের কাছে অনেক প্রিয়, অনেক আনন্দের।

উত্তরপ্রদেশের মানুষ ঠিকই বলে, দূরকা ঢোল সাহানাই বরাবর। সত্যি, দূরের ঢোল সানাইয়ের মতই মধুর।

জীবজগতের কোন কিছুই চিরকালের জন্য এক জায়গায় থাকতে পারে না। জীবন-পথের বিবর্তনের মাঝেও সে পরিবর্তন চায় পারিপার্শ্বিকের। কীট পতঙ্গ পশু-পক্ষী থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত চিরকাল ধরে ভ্রমণবিলাসী। তা না হলে সেই সুদূর সাইবেরিয়ার নিজের ঘর ছেড়ে হাজার হাজার পাখি কিসের মোহে, কার আকর্ষণে যে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় উড়ে আসে, তা শুধু ওরাই জানে।

অতীতে শুধু মার্কোপোলো, আলেকজাণ্ডার, হিউয়েন সাঙ, ইবনবতুতা কিংবা ভাস্কো ডা গামাই ঘর ছেড়ে বেরোন নি, আরো অনেকেই বেরিয়েছেন। মার্কোপোলোর সব সঙ্গীই কী স্বদেশে ফিরেছিলেন? আলেকজাণ্ডারের বিরাট সৈন্যবাহিনীর অনেকেই দেশে ফিরে যান নি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তারা নতুন দেশে নতুন সংসার পেতেছেন। শুধু ওরাই না, পৃথিবীর বহু দেশের অসংখ্য সওদাগরই সমুদ্রপথে বেরিয়ে আর ফিরে আসেন নি। যারা ফিরে এসেছেন, তাদের অনেকেই আবার বেরিয়েছেন জীবনের টানে বা জীবিকার প্রয়োজনে।

মানুষের এই পথ চলা কোনদিন থামেনি, থামবে না। কাজে অকাজে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সুখে-দুঃখে মানুষকে ঘর ছেড়ে বেরুতেই হয়। হবেই। মানুষ নিজের ঘর, নিজের সংসারকে যত সুন্দর করছে, তার ঘর ছেড়ে পৃথিবী বিচরণও ততই বাড়ছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘাত-

সংঘর্ষ, পর্বতপ্রমাণ বিধিনিষেধ দিয়েও কেউ কোনদিন মানুষের পথ চলা বন্ধ করতে পারে নি। পারবে না।

মা ধরিত্রীই তো সৃষ্টির আদিমতম যাযাবর। সে তো কখনই স্থির হয়ে থাকতে পারে না। এই যাযাবর মা'র সন্তান হয়ে আমরা কী ঘরের কোণেও দু'পাঁচজন আত্মীয়-বন্ধুর মোহে বন্দী থাকতে পারি ?

যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যাযাবর বৃত্তি বেড়েই চলেছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আরো আরো বেশী মানুষ ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছেন। কোন অশরীরী আত্মা যেন অহর্নিশ মানুষের কানে কানে বলছেন, চরৈবেতি, চরৈবেতি ! চলো, চলো, আরো চলো, আবার চলো।

পৃথিবীর কোন মহাশক্তিই মানুষের পায়ে শিকল পরাতে না পারলেও দেশ থেকে দেশান্তরে মানুষের চলা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আছে পাসপোর্ট, আছে ভিসা। প্রতি দেশের সীমানা অতিক্রমের সময় তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। পাসপোর্টের অঙ্গে মোহরের ছাপ মেরে সযত্নে সতর্কে তার আগমন-নির্গমনের হিসাব রক্ষা করা হয়। শুধু তাই না। বাক্স-পেঁটরা পোঁটলা-পুঁটলি তল্লাসী করে দেখা হয়, বাছাধন কি নিয়ে এলেন, কি নিয়ে গেলেন।

পাশ্চাত্য দেশে ও দেশবাসীর কাছে এসব ব্যাপার ডাল-ভাত। সকালে প্যারিসে ব্রেকফাস্ট খেয়ে মিলানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ সেরে ভিয়েনায় লাঞ্চের পর কনফারেন্সে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে বার্লিনে বান্ধবীর উষ্ণ সান্নিধ্যে নাচ-গান-ডিনার শেষ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রেয়সীর শুধু একটা চুম্বনের জন্য বস্টনের ছেলে-ছোকরাদের গাড়ি নিয়ে কানাডার কোন সীমান্ত শহরে ছুটে যাওয়া বা নায়েগ্রার ধারে ঘূর্ণায়মান কাফেতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলে বাড়ির কেউ জানতেও পারেন না।

সমস্যা সমাজতান্ত্রিক ও এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিতে।

কোথাও রাজনৈতিক কারণে, কোথাও অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য মানুষের ঘোরাঘুরির পথে বহু বাধা, বহু বিঘ্ন।

অতীত দিনের ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ নিয়মিত সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, হিমালয়ও অতিক্রম করেছেন। তাদের অনেকের অনেক কথাই ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজো ছড়িয়ে থাকে। তারপর কত কী অঘটন ঘটে গেল। এই বিরাট উপমহাদেশের সমস্ত মানুষগুলো যেন বাতগ্রস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রইল। কাশী গয়া যাত্রাকেই অন্তিম যাত্রা মনে করতেন আত্মীয়-স্বজনের দল। ওপার থেকে সাহেব-মেমেরা এলেন, আমরা ইংরেজি বুলি শিখলাম কিন্তু যে দেশের অতি সাধারণ সওদাগরের দল নির্বিবাদে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর নানা দিগন্তে মসলিন ও তাঁতের শাড়ি বিক্রি করতেন, সে দেশেরই আলালের ঘরের দু'একটি দুলাল কালাপানি পাড়ি দিলে হৈচৈ পড়ে যেত। গঙ্গা দিয়ে অনেক অনেক জল গড়িয়ে গেছে কিন্তু আজো মানুষের শেয়ার বাজারে বিলেতফেরতের দাম বেশ চড়া।

সে-যাই হোক ঝগড়া-বিবাদ সংঘাত-সংঘর্ষ ও সর্বোপরি অসংখ্য মানুষের অনেক রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে এই উপমহাদেশ টুকরো টুকরো হবার পর ভারতবাসীরা লণ্ডন নিউ ইয়র্ক-প্যারিস যেতে ভয় না পেলেও পাকিস্তান যেতে দ্বিধা করেছে। বিদ্বেষ ও হিংসার মধ্যে দিয়ে যে দুটি দেশের জন্ম, সে দেশের মানুষের মনে এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় থাকবেই। বিস্ময় ও মজার কথা পাকিস্তানের বুক চিরে নতুন বাংলাদেশের জন্ম হবার পরও এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কালো মেঘ পুরোপুরি কাটে নি।

উড়োজাহাজের বড়লোক খদ্দেরদেরও বিমান বন্দরে পাসপোর্ট ভিসা পরীক্ষা ও মালপত্র তল্লাসী হয় কিন্তু সেখানে তেমন ভীতি বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে না। হতভাগ্যের দল যাতায়াত করেন হরিদাসপুর-বেনাপোলের মত সীমান্ত চেকপোস্ট অতিক্রম করে। এই সীমানা পার হওয়া নিয়ে সংশয় নেই, এমন মানুষ সত্যি দুর্লভ।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়দের বিদায় জানিয়ে নিত্যর অফিসে ফেরার পথে জয়ন্তী একটু চাপা গলায় আমাকে বললেন, এই বর্ডারের ভয়ে আমি বিশেষ রংপুর যাই না।

—কিসের ভয় ?

—ঝামেলার ভয়, নাস্তানাবুদ হবার ভয়।

আমি কোন মন্তব্য করি না। ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি, আপনি একেবারেই রংপুর যান না ?

—প্রায় চোদ্দ-পনের বছর আগে একবার আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম। একটু থেমে বলেন, তাও হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়েছিলেন বলেই গিয়েছিলাম।

আমি একটু হেসে, একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, এই এত বছরের মধ্যে আর যান নি ?

—না।

হঠাৎ যেন দুষ্টু সরস্বতী আমার জিহ্বায় বসায় আমি ওকে বলি, এবার কী আমার সঙ্গে দেখা হবে বলেই···

পুরো কথাটা শেষ করার আগেই জয়ন্তী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, জানি না ; আমি কী জ্যোতিষী ?

নিত্য নিজের আসন অলংকৃত করেই আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ফতোয়া জারী করল, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনকে ছাড়া হবে।

আমরা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে আপীল করি। জয়ন্তী বললেন, আপনি আপনার বন্ধুকে রেখে দিন কিন্তু আমাকে আর আটকাবেন না। আমাকে আবার টিকিট-ফিকিটের ব্যবস্থা করে ট্রেন ধরতে হবে।

নিত্য নির্বিকারভাবে হাসতে হাসতে বলল, আপনার গাড়ি তো মাঝ রাত্তিরে। এখন গিয়ে কী করবেন ?

—টিকিট রিজার্ভেশনের চেষ্টা করতে হবে না ?

—সেসব হয়ে যাবে ; কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললাম, না ভাই নিত্য, যশোরে আমার কাজ আছে। তাছাড়া আজই ঢাকায় পৌঁছতে পারলে ভাল হয়।

ওর মুখে এবারও সেই নির্বিকার হাসি। বলল, এত বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা। এক কাপ চা খেয়ে চলে যেতে চাইলেই কী আমি যেতে দিতে পারি?

আমরা দুজনেই অনেক অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন-নিবেদন করলাম কিন্তু হরিদাসপুর ইমিগ্রেশন-চেকপোস্টের ভাগ্যবিধাতা তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন না। আমাদের চায়ের ব্যবস্থা করে নিত্য একটু বেরুল। বেরুবার সময় শুধু বলল, আমি এখুনি আসছি।

ও ঘর থেকে বেরুতেই জয়ন্তী বললেন, আপনার বন্ধু এমন করে বললেন যে বেশী কিছু বলতে পারলাম না কিন্তু···

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনার আর কী? ও তো আপনার টিকিটের ব্যবস্থা করেই দেবে কিন্তু মুশকিলে পড়লাম আমি।

—আপনার মত সাংবাদিকের আবার মুশকিল কী?

—না, না, আমার আবার মুশকিল কী? যত মুশকিল আপনার!

—একশ' বার। আমি মেয়ে, আপনি ছেলে। তাছাড়া আমি একলা একলা যাচ্ছি।

আমি এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটু সতর্ক হয়ে চাপা গলায় বলি, কে আপনাকে একলা যেতে বলেছে?

এ সংসারে চপলতা শুধু কিশোর-কিশোরীর জীবনেই ঘটে না; জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আমরা সবাই চপলতা প্রকাশ না করে পারি না। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, চপলতা ঘটে যায়। আমি ভাবি নি, এমন চপলতা প্রকাশ করব কিন্তু যা ভাবা যায় না, তা তো ঘটে। নিত্যই ঘটে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, বোধহয় অন্যায় করলাম।

উনি আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসেন।

আমি খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, যাক, বাঁচালেন।

জয়ন্তী একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, তার মানে ?

—আপনার হাসি দেখে বুঝলাম, আপনি রাগ করেন নি।

—কেন ? রাগ করব কেন ?

—হঠাৎ একটু চপলতা প্রকাশ করেই মনে হয়েছিল, বোধহয় আপনি অসন্তুষ্ট হবেন।

জয়ন্তী বেশ গম্ভীর হয়েই বললেন, এ সংসারে বেঁচে থাকার ঝামেলা তো কম নয় কিন্তু একটু-আধটু হাসি-ঠাট্টা বা চপলতা না হলে কী আমরা কেউ বাঁচতে পারব ?

উনি একটু থেমে আবার বলেন, আমি নিজেও বেশী গম্ভীর থাকতে পারি না ; আবার বেশী গম্ভীর লোককে বেশীক্ষণ সহ্যও করতে পারি না।

—আমিও তাই।

—সে আপনাকে দেখেই বুঝেছি।

এবার খুব উৎসাহের সঙ্গে প্রশ্ন করি, আমাকে দেখে আর কী বুঝেছেন ?

জয়ন্তী চাপা হাসি হেসে বললেন, এখনই সব কথা বলব কেন ?

ওর কথায় আমি হেসে উঠি।

একটু পরেই নিত্য ঘুরে এসে জয়ন্তীকে বলল, আপনি যশোর স্টেশনের এ-এস-এম-এর কাছে গেলেই টিকিট পেয়ে যাবেন। তাছাড়া উনি আপনাকে ট্রেনে চড়িয়ে দেবারও ব্যবস্থা করবেন।

আমি চাপা হাসি হেসে বললাম, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয় !

ওরা দুজনেই হাসে।

এবার নিত্য ওকে বলে, আমরা চেকপোস্টের সবাই সামনের একটা ব্যারাকে থাকি। ওখানে তো আপনাকে নিতে পারি না। দরজার পাশে দাঁড়ান কাস্টমস-এর একজন মহিলা কর্মীকে দেখিয়ে

বলল, আপনি এই দিদির সঙ্গে কাস্টমস-এর গেস্ট হাউসে চলে যান। ওখানে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমরা দুজনে খানিকটা পরেই আসছি।

জয়ন্তী বললেন, আমার জন্য আপনাদের সবার এত কষ্ট···

—কিছু কষ্ট না। নিত্য একটু হেসে বলল, সবাই তো মনে মনে আমাদের গালাগালি দেয়। ক'জন লোক আর আমাদের আপন মনে করে? মন খুলে কথা বলার মত লোক পেলে আমাদের ভালই লাগে।

জয়ন্তী আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন।

নিত্য ওর সহকর্মীদের বলে আমাকে নিয়ে ওদের ব্যারাকে গেল। বলল, চলো বাচ্চু, একটু গল্পগুজব করা যাক।

চেকপোস্টের ঠিক উল্টোদিকেই একটা লম্বা চালাঘর। মাঝে মাঝে পার্টিশন করা। আমি অবাক হয়ে বললাম, এত বছর ধরে তোমাদের চেকপোস্ট হয়েছে কিন্তু তোমাদের কোয়ার্টার তৈরী হয় নি?

—না, ভাই।

—এখানে দিনের পর দিন থাকো কী করে? তাছাড়া তোমাদের কেউই তো ফ্যামিলি আনতে পারে না।

নিত্য একটু ম্লান হেসে বলল, আমাদের এসব দুঃখের কথা কে বোঝে আর কে শোনে? তাছাড়া পুলিসের লোকজনেরও যে দুঃখ-কষ্ট আছে, তা ক'জন বিশ্বাস করে?

পাশাপাশি দুটো তক্তপোশের উপর বালিশে হেলান দিয়ে আমরা মুখোমুখি বসে কথা বলি। ও পকেট থেকে একটা লাল সিগারেটের প্যাকেট বের করতেই আমি জিজ্ঞেস করি, এ আবার কী সিগারেট? এ রকম প্যাকেট তো দেখিনি।

নিত্য প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বলল, এ তো আমাদের দেশের সিগারেট না, ওপারের।

—হ্যাঁ, তাই দেখছি।

—খেয়ে দেখ, বেশ ভাল সিগারেট।

গোল্ড লিফ সিগারেটে টান দিয়ে বলি, হঁ্যা, বেশ ভাল সিগারেট।

নিত্যও একটা সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বলে, বললাম না!

—বনগাঁয় কী এই সিগারেট পাওয়া যায়?

ও একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, না পাওয়া গেলেও আমরা পেয়ে যাই। মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলল, লোকজন দিয়ে যায় বলেই খাই। নিজের পয়সায় কী এইসব সিগারেট খাওয়া যায়?

আমি হেসে বলি, তাহলে ভালই আছো, কী বলো?

—ভাল আছি, তাও বলতে পারি না; আবার ভাল নেই, তাও বলা ঠিক হবে না।

—তার মানে?

নিত্য সিগারেটে একটা টান দিয়ে তুড়ি দিয়ে ছাই ফেলে বলল, জানোই তো পুলিসের চাকরিতে সব সময় টু পাইস এক্সট্রা ইনকাম থাকে। আই-বি'র মত দু' একটা জায়গা ছাড়া এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমাদের এক্সট্রা ইনকাম নেই।

ওর কথায় আমি হাসি।

—হাসছ কী ভাই? আজকাল কলকাতা পুলিসের এমন কনস্টেবলও আছে, যারা মাসে মাসে দশ হাজার টাকার বেশী আয় করে।

—বলো কী?

—তুমি তো দিল্লী চলে গেছ, তাই কলকাতার খবর রাখো না। যে পুলিসকে চোর-ডাকাত গুণ্ডা-বদমাইশরা ভয় করত, সে পুলিস আর নেই। এখন আমরাই ওদের ভয় করি।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, কেন?

একটু ম্লান হাসি হেসে নিত্য বলল, আজকাল পলিটিসিয়ানদের হাতে গুণ্ডারা, নাকি গুণ্ডাদের হাতে পলিটিসিয়ানরা, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

—কিন্তু· ·

ও মাথা নেড়ে বলল, কোন কিছু নেই ভাই। আজকাল আমরা নেংটি ইঁদুর ধরলেও হয় বাঘ, না হয় সিংহ গর্জন করে উঠবেই।

আমি প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করি, যাই হোক, তুমি এখানে কেমন আছো, তাই বলো।

—পোস্টিং হিসেবে ভালই তবে···

—ভালই মানে ?

নিত্য একটুও দ্বিধা না করে বলল, ভালই মানে না চাইলেও বেশ টু পাইস ইনকাম আছে এখানে। আর তাছাড়া খুব ইন্টারেস্টিং।

—ইন্টারেস্টিং মানে ?

—ইন্টারেস্টিং মানে বহু বিখ্যাত মানুষ থেকে শুরু করে নানা ধরনের নানা মানুষ দেখা যায়। ও একটু থেমে বলল, থানায় মোটামুটি একই ধরনের ঘটনা বা মানুষ দেখা যায় কিন্তু এখানে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা হয়।

আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। নিত্য বলে যায়, এই চেকপোস্টে বসে বসে কত মানুষের কত কাহিনী যে জানলাম, কত রকমের কত ঘটনা যে চোখের সামনে দেখলাম, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, ভাই। একটু শুকনো হাসি হেসে বলল, ফেরার পথে এখানে দু'একদিন থাকলে তোমাকে সব বলব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই থাকব।

চার

আমার আর জয়ন্তীর বিদায় সম্বর্ধনাও মন্দ হলো না। হাজার হোক চেকপোস্টের ও-সি সাহেবের বন্ধু! সেই সকাল থেকে এই অপরাহ্ণ বেলা পর্যন্ত, চেকপোস্টে ও কাস্টমস কলোনীতে কাটিয়ে

অনেক নতুন বন্ধু হলো। সত্যি ভাল লাগল। ঐ খাকি পোশাক দেখলেই আমরা ভুলে যাই যে ঐ পোশাকের মধ্যেও একটা মানুষ লুকিয়ে থাকে। এবং আমাদের আর পাঁচজনের মতই ওদের জীবনেও সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। পুলিস বা কাস্টমস-এর লোকজনদের কী মন নেই? না মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসা নেই?

এই তো কাস্টমস-এর নীরোদবাবু বলছিলেন, সাধারণত সন্ধ্যে হতে না হতেই বর্ডার দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

—কেন? তখন কী দু'দিকের চেকপোস্ট বন্ধ হয়ে যায়?

—না, না, সারা রাত ধরেই দু'দিকের চেকপোস্ট-কাস্টমস কাউণ্টারে লোক থাকে। তবে সন্ধ্যের পর গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া যায় না বলেই লোকজন যাতায়াত করে না।

—ও!

নীরোদবাবু একটু থেমে বললেন, বর্ডারের খুব কাছাকাছি যারা যাবেন বা কিছু ব্যবসাদার কাজকর্মে আটকে গেলে রাত্রেও যাতায়াত করেন। ওরা ছাড়া আর বিশেষ কেউ যাওয়া-আসা করেন না।

এবার আমি বলি, কী যেন বলবেন বলছিলেন?

—একটা ঘটনার কথা বলব।

—বলুন।

নীরোদবাবু সেদিন ভিতরে বসে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কি যেন কাজ করছিলেন। একজন ইন্সপেক্টর এসে বললেন, নীরোদদা, একজন ভদ্রমহিলা আপনার জন্য আমাদের কাউণ্টারের ওখানে অপেক্ষা করছেন।

নীরোদবাবু একটু ব্যস্তই ছিলেন। তাই কাজ করতে করতেই জিজ্ঞেস করলেন, আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নাকি?

—তা তো জানি না।

—আচ্ছা আসছি।

হাতের কাজ সেরে উনি সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের ঘর ঘুরে কাস্টমস চেকিং কাউণ্টারের সামনে গিয়ে একবার চারদিক দেখে নিলেন। না, জানাশোনা কেউ নেই। ওকে দেখেই অন্য একজন ইন্সপেক্টর বললেন, নীরোদবাবু, এই যে ইনি আপনার খোঁজ করছেন।

নীরোদবাবু কিছু বলার আগেই ঐ ভদ্রমহিলা কোলের ছোট বাচ্চাকে কোনমতে সামলে নিয়েই ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। নীরোদবাবু অবাক হয়ে বললেন, আরে! কী করছেন?

ভদ্রমহিলা নীরোদবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, দাদা, আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে শুধু চিনিই না, সারা জীবনেও আপনাকে ভুলব না।

উনি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, কেন বলুন তো?

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে নিঃসঙ্কোচে বললেন, দেখছেন তো দাদা, আমার শ্বেতী। হাজার লেখাপড়া শিখলেও ঘুষ না দিলে কী আমার মত মেয়ের বিয়ে হয়?

শুধু নীরোদবাবু না, কাস্টমস কাউণ্টারের সমস্ত ইন্সপেক্টর, কর্মী ও বেশ কিছু যাত্রী অবাক হয়ে ওঁর কথা শোনেন।

ভদ্রমহিলা এবার বললেন, দাদা, আপনি দয়া না করলে আমার বিয়ে হতো না, তা কী জানেন?

বিস্মিত নীরোদবাবু বললেন, আমি আবার আপনার কী উপকার করলাম?

—হ্যাঁ দাদা, করেছেন। ভদ্রমহিলা এক নিঃশ্বাসে বলে যান, আমার ননদের দাবী মেটাবার জন্য আমার বাবা বাধ্য হয়ে অনেক বিদেশী জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিলেন। আপনি ঐসব জিনিসপত্র ছেড়ে না দিলে সত্যি আমার বিয়ে হতো না।

নীরোদবাবু একটু হেসে বললেন, কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।

—গত বছর সাতুই ফেব্রুয়ারী রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার সময় আমার বাবা অনেক বিদেশী জিনিসপত্র নিয়ে ওপার থেকে এপারে এসেছিলেন।

প্রতিদিন কত শত শত মানুষ এই সীমান্ত দিয়ে পারাপার করেন। কে কার কথা মনে রাখে? নাকি ইচ্ছা করলেও মনে রাখা যায়? অসম্ভব। তবু নীরোদবাবু একবার সেই দেড় বছর আগের রাত্রে ফিরে যাবার চেষ্টা করেন।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে বলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই আপনি বাবাকে প্রথমে বিশ্বাস করেন নি কিন্তু তারপর হঠাৎ বাবা হাউহাউ করে কেঁদে উঠল··

হঠাৎ নীরোদবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আপনার বাবা তো বাগেরহাটে থাকেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—আপনার বাবার নাম তো মাধব সরকার, তাই না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তারই মেয়ে জবা।

ঐ খাকি পোশাকপরা শুধু নীরোদবাবু না, কাস্টমস কাউন্টারের সবাই আনন্দে খুশিতে চোখের জল ফেলেছিলেন। তারপর জবা আর ঐ কয়েক মাসের বাচ্চা ও ছোট ভাইকে নিয়ে সে কী আনন্দোৎসব!

নীরোদবাবু আমাকে বলেছিলেন, জানেন বাচ্চুবাবু, ভদ্রবেশী চোর ও মিথ্যাবাদী মানুষ দেখতে দেখতে আমরা কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারি না। সেদিন রাত্রে বাগেরহাটের ঐ ব্যবসাদার মাধব সরকারকেও প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি কিন্তু তার চোখের জলের কাছে আমি হেরে গেলাম।

আমি অবাক হয়ে ওঁর কথা শুনি।

উনি বলে যান, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, আমরাও মাঝে মাঝে মানুষের উপকার করি। এই জবার মত ভাইবোনের সংখ্যা আমাদের নেহাত কম নয়।

নীরোদবাবু লুকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, জীবনে নিশ্চয়ই অনেক পাপ করেছি কিন্তু তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, এইসব জবাদের কৃপাতেই শেষ পর্যন্ত বৈতরণী পার হয়ে যাব।

নিত্যর কৃপায় শুধু এপারের কাস্টমস নয়, ওপারের কাস্টমস ও চেকপোস্টও হাসতে হাসতে আমি আর জয়ন্তী পার হলাম। কপালে বোনাসও জুটে গেল। কাস্টমস সুপারিনটেনডেন্ট হবিবুর রহমান সাহেব ডাব খাওয়ালেন। ওপারের চেকপোস্টের ও-সি মহীউদ্দীন সাহেব নিজে অটো-রিকশায় চড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, এই দাদা-দিদিকে ঠিকমত পৌঁছে দিবি। দরকার হলে ওরা শহরের মধ্যেও তোর গাড়িতে ঘুরবেন।

ড্রাইভার সসম্ভ্রমে বলল, জী!

—আর হ্যাঁ, আজই ভাড়া নিবি না। ফেরার দিন দাদার কাছে সব শোনার পর ভাড়া পাবি।

—জী।

আমি মহীউদ্দীন সাহেবকে বললাম, ও আমাদের ঠিকই পৌঁছে দেবে। ওকে ভাড়াটা নেবার অনুমতি দিন। তা না হলে বড়ই অস্বস্তি বোধ করব।

মহীউদ্দীন সাহেব একটু হেসে বললেন, আমি জানি ও আপনাদের ঠিকই পৌঁছে দেবে কিন্তু আপনার কাছ থেকে সব শোনার পর ভাড়া দিলে আমি মনে শান্তি পাব।

এবার উনি জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার ট্রেনের সময় স্টেশন মাস্টার ডিউটিতে থাকবেন না বলেই এ-এস-এম-এর কাছে

আপনার টিকিট থাকবে। উনি আপনাকে ট্রেনেও চড়িয়ে দেবেন। মনে হয় কোন অসুবিধা হবে না।

জয়ন্তী কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে বললেন, আপনি যখন ব্যবস্থা করেছেন, তখন অসুবিধে যে হবে না, তা আমি ভাল করেই জানি।

আমরা দুজনেই ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে অটো-রিকশায় উঠি। অটো-রিকশা স্টার্ট করার ঠিক আগে নিত্য আমাকে বলল, বাচ্চু, ফেরার পথে তুমি কিন্তু কয়েকদিন এখানে থাকবে।

—হ্যাঁ, থাকব বৈকি !

এবার ও জয়ন্তীকে বলে, আপনিও যদি ফেরার পথে অন্তত একটা দিন থেকে যান, তাহলে খুব খুশি হবো।

—যদি রংপুর থেকে একদিন আগে রওনা হতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই থাকব।

মহীউদ্দীন সাহেব আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুধু নিত্যবাবুর না, আমারও নেমন্তন্ন রইল।

আমি হাসলাম।

জয়ন্তী বললেন, তা জানি।

ভোরবেলায় যখন শিয়ালদ' স্টেশনে বনগাঁ লোক্যালে চড়ি, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, এত সব ঘটে যাবে। কোথায় ছিলেন পার্ক সার্কাসের মাসীমা-মেসোমশাই, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আর জয়ন্তী? এদের কারুর সঙ্গেই আমার পরিচয় হবার কথা নয় কিন্তু এখন বার বার মনে হচ্ছে, কবে মাসীমার বাড়ি যাব, কবে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা দেব? আর জয়ন্তী?

—কী ভাবছেন ?

ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিলাম। জয়ন্তীর প্রশ্ন শুনে সম্বিত ফিরে আসে। বলি, আজ সারা দিনের কথা ভাবছি।

বনগাঁ লোক্যালে কারুর সঙ্গে আলাপ হবে, তাও ভাবিনি, আবার বর্ডারে এতজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে, তাও আশা করিনি।

—শুধু আলাপ-পরিচয় কেন বলছেন ? মনে হচ্ছে সবার সঙ্গেই যেন কত দিনের পরিচয়

—ঠিক বলেছেন। একটু থেমে বললাম, মাসীমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।

—উনি বড্ড বেশী স্নেহপরায়ণা।

—মা-মাসীরা একটু বেশী স্নেহপরায়ণা না হলে কী ভাল লাগে? ওদের কাছে একটু বেহিসেবী স্নেহ-ভালবাসা না পেলে মন ভরে না।

জয়ন্তী একটু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনার মা নিশ্চয়ই আপনাকে খুব বেশী ভালবাসেন ?

আমিও হাসি। বোধহয় একটু ম্লান হাসি। বলি, সারা জীবনের মাতৃস্নেহ আমি সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যেই উপভোগ করেছি বলে তিনি আর বেঁচে থাকারই প্রয়োজনবোধ করলেন না।

আমার কথা শুনে উনি যেন চমকে উঠলেন। বললেন, ঐ অত ছোটবেলায় আপনি মাকে হারিয়েছেন ?

মুখে না, শুধু মাথা নেড়ে বলি, হ্যাঁ।

নাভারণ বাজার পিছনে ফেলে অটো-রিকশা এগিয়ে চলে। আমি আপন মনে সিগারেট খেতে খেতে এদিক-ওদিক দেখি ও কত কি ভাবি।

গদখালি পৌঁছবার খানিকক্ষণ আগে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো ? কোন কথা বলছেন না যে !

—কী বলব বলুন ?

সত্যি, কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। ভাবছিলাম, যেসব আলাপ পরিচয় হয়ত দীর্ঘস্থায়ী হবে না, সেখানে বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়া কী ঠিক ? এই যে মাসীমাকে আমার এত ভাল লেগেছে কিন্তু ক'দিন ওর সঙ্গে দেখা হবে? আদৌ দেখা হবে কী? এই জয়ন্তীর সঙ্গে কোন

একজনের এমন কিছু মিল আছে যে ওকে কোন সময়েই খুব দূরের মানুষ মনে করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু জীবনে কী আর কোনদিন এর সঙ্গে দেখা হবে ?

জয়ন্তী বললেন, প্রশ্ন না করলেই কী কিছু বলতে নেই ?

আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, অনেকে বলেন. রেলগাড়ির পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে···

—আপনি তো আচ্ছা লোক ! সাংবাদিক হয়েও এইসব বিশ্বাস করেন ?

—বিশ্বাস করি না কিন্তু যদি সত্যি হয় ?

জয়ন্তী একটু হেসে বললেন, আপনি নেহাতই ছেলেমানুষ !

—বোধহয়। এবার ওর দিকে তাকিয়ে বলি, পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। যে জীবনে যা কিছু আঁকড়ে ধরতে যায়, তাই যখন হারায়, তখন তার মনে একটু ভয় থাকা স্বাভাবিক নয় কী ?

কথাটা বলেই মনে হলো, না বলাই উচিত ছিল। আমি কী পেয়েছি যে হারাবার ভয় করছি ?

অটো-রিকশা গদখালি পার হলো।

আমার কথা শুনে উনি শুধু একটু হাসলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী আজই যশোর থেকে ঢাকা যাবেন ?

—যশোরে একটু কাজ আছে। তাছাড়া ঢাকার শেষ ফ্লাইটও দুপুরের আগেই ছেড়ে যায়।

—তাহলে আজ যশোরে থাকবেন ?

—হ্যাঁ।

—আবার কবে ফিরবেন ?

—দশই ডিসেম্বর আমাকে কলকাতায় থাকতেই হবে।

দু'এক মিনিট পরে জয়ন্তী আবার প্রশ্ন করেন, আপনি তো দিল্লী থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—কবে দিল্লী ফিরবেন ?

—যদি ভাল লাগে তাহলে আট দশ দিন কলকাতায় থাকব ; আর ভাল না লাগলে তার আগেই চলে যাব।

ও একটু অবাক হয়ে বলে, আট দশ দিনও কলকাতা ভাল লাগবে না ?

আমি একটু ম্লান হাসি হেসে বলি, দিল্লীতে কিছুদিন কাটাবার পরই মনে হয়, কলকাতায় ছুটে চলে যাই। মাঝে মাঝেই কলকাতা চলে আসি কিন্তু কিছুতেই বেশী দিন থাকতে পারি না।

—কেন ?

আমি যেন আপন মনেই বলি, কেন ? তারপর বলি, কলকাতার পথে-ঘাটে আমার এত সুখ-দুঃখের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে যে বেশী দিন থাকতে পারি না।

দু'এক মিনিট নীরব থাকার পর উনি বললেন, জীবনে আপনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তাই না ?

—দুঃখ ? হ্যাঁ, পেয়েছি বৈকি কিন্তু মাঝে মাঝে এত আনন্দ, এত সুখ পেয়েছি যে সত্যি অভাবনীয়। আমি একটু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে শাহীর লুধিয়ানভীর একটা শের-এর দুটো লাইন বলি—

রাত যিতনী ভী সংগীন হোগী
সুবহ উৎনি হী রংগীন হোগী ;

একটু হেসে বলি, আমার জীবনে অমাবস্যা-পূর্ণিমার মত সংগীন রাত আর রংগীন সুবহ বার বার ঘুরে এসেছে।

* * *

রাত্রে ট্রেনে চড়িয়ে দেবার সময় জয়ন্তী বললেন, আমি নিশ্চয়ই সাত তারিখে বর্ডার পার হবো। আপনি সাত তারিখে ওখানে থাকলে খুব খুশি হবো।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, বান্দা, সাত তারিখেই বর্ডারে পৌঁছবে।

ঐ মাঝ রাত্তিরে যশোর স্টেশনের আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখলাম, আনন্দে খুশিতে জয়ন্তীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পাঁচ

পাঁচ তারিখের মধ্যেই আমার কাজকর্ম শেষ হলেও মহিলা সমিতির মঞ্চে নতুন এক নাট্যগোষ্ঠীর নাটক দেখার জন্য ছ' তারিখ ঢাকায় রইলাম। সাত তারিখের সেকেণ্ড ফ্লাইটে যশোর হয়ে যখন বেনাপোল সীমান্তে পৌঁছলাম, তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

হাতের সুটকেসটা নিয়ে চেকপোস্টের ও-সি মহীউদ্দীন সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখি, উনি নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই একজন কনস্টেবল আমাকে সেলাম দিয়ে বললেন, ঘোষ সাহেব এসেছেন বলে ও-সি সাহেব কাস্টমস সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবের ওখানে গিয়েছেন।

মনে হলো, কনস্টেবলটি যাবার দিন নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছিলেন। তাই ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ঘোষ সাহেব ?

আমার প্রশ্ন শুনে উনি যেন অবাকই হলেন। বললেন, আপনি ঘোষ সাহেবকে চেনেন না ? ওকে তো কলকাতার সবাই চেনেন।...

—আমি তো কলকাতায় থাকি না।

—ও! আমার অজ্ঞানতার কারণে উনি বোধহয় সন্তুষ্ট হলেন। বললেন, ঘোষ সাহেব কোটি কোটি টাকার মালিক। আমাদের দেশেরই মানুষ। প্রায়ই যাতায়াত করেন।

ও!

মহীউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য কাস্টমস বিল্ডিং-এর দিকে যেতে যেতে ভাবি, পয়সা থাকলেই কী সর্বত্র খাতির পাওয়া যায় ? নাকি অর্থ দেখলেই মানুষ গোলাম হতে চায় ?

মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েই কাস্টমস বিল্ডিং-এ ঢুকি। বারান্দা পার হয়ে মালপত্র তল্লাসীর হলঘরে পা দিয়েই দেখি, কাউন্টারের একদিকে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে ঘিরে এপার-ওপার দুদিকের কাস্টমস-ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের অনেকেই হাসি-ঠাট্টায় মত্ত। আমি বুঝলাম, ঐ মধ্যবয়সী ভদ্রলোকই কোটিপতি মিঃ ঘোষ।

আমি আর এগুলাম না। বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম। ঘোষ সাহেবকে নিয়ে কখন আড্ডা শুরু হয়েছে আর কখন শেষ হবে, তা ভেবে না পেয়ে সিগারেট শেষ হবার পর নীচে নেমে এসে একটা ডাব খেলাম। তারপর একটু পায়চারি করতে করতেই দেখি, ঘোষ সাহেব সদলবলে বেরিয়ে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি একটু দূরে সরে গেলাম।

দূর থেকে দেখলাম, পুলিস কাস্টমস-এর লোকজন ঘোষ সাহেবের মালপত্র গাড়িতে তুলল। তারপর উনি কাস্টমস সুপারিনটেনডেণ্ট রহমান সাহেব ও মহীউদ্দীন সাহেব থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কনস্টেবলকে পর্যন্ত বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলেন। মনে মনে ভাবি, লোকটি নিশ্চয়ই স্মাগলার! তা নয়ত এদের সবার সঙ্গে এত খাতির ভালবাসা কেন?

মিঃ ঘোষের গাড়ি ছাড়ার পর আমি কয়েক পা এগুতেই মহীউদ্দীন সাহেব আমাকে দেখে প্রায় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনি কখন এলেন?

—এখনও আধঘণ্টা হয় নি।

—সে কী? উনি অবাক হয়ে বললেন, আমাকে ডাকেন নি কেন? ছি, ছি, এতক্ষণ আপনি···

—না, না, আমার কিছু কষ্ট হয় নি। দেখলাম, আপনারা গল্প করছেন, তাই আর বিরক্ত করলাম না।

উনি মাথা নেড়ে বললেন, আপনি ডাকলে বিরক্ত হতাম, কী যে

বলেন! সঙ্গে সঙ্গে উনি আক্ষেপ করে বললেন, তাছাড়া অমলের সঙ্গে আলাপ হলে আপনিও খুশি হতেন।

—কে অমল?

—অমল ঘোষ। এই তো যার সঙ্গে আমরা সবাই গান করছিলাম।

মনে মনে বলি, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ অমল ঘোষ আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে আমি একটুও আগ্রহী নই। তাছাড়া কোটিপতিকে আমার কী প্রয়োজন? আমি তো তাদের খাতির বা গোলামি করতে পারব না। যাই হোক, আমি শুধু বললাম, ব্যস্ত কী? হয়ত ভবিষ্যতে কোনদিন আলাপ হবে।

মহীউদ্দীন সাহেব আমাকে নিয়ে ওর অফিস ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, তা হয়ত হবে কিন্তু অমলের মত হীরের টুকরো ছেলের সঙ্গে যত আলাপ হয়, ততই ভাল।

আমি ওর কথা শুনে একটু অবাক হলেও কোন কথা বলি না।

মহীউদ্দীন সাহেব আমাকে সাদরে নিজের ঘরে বসিয়েই একজন কনস্টেবলকে দৌড়ে ডাব আনতে হুকুম দিয়েই আমাকে বললেন, আপনার বন্ধু আসার আগেই বলে রাখি আজ রাত্তিরে আপনি আমার ওখানেই দুটো মাছের ঝোল ভাত খাবেন।

আমি হেসে বলি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

—আমি তো দু' একদিন আছি। পরে···

—না, না, পরে-টরে না। আজ রাত্তিরে আমার সঙ্গে মাছের ঝোল ভাত খেয়ে তবে ইণ্ডিয়ায় ঢুকবেন।

আমি ডাব খেয়ে সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই নিত্য ও আরো কয়েকজন হাজির হলো। মহীউদ্দীন সাহেব হাসতে হাসতে নিত্যকে বললেন, বাচ্চুবাবু আজ ইণ্ডিয়ায় যাবেন কিনা সন্দেহ।

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হাসাহাসির পর আমি নিত্যর সঙ্গে এবারে

কাস্টমস কলোনীর গেস্ট হাউসে গেলাম। নিত্য ও কাস্টমস এর কিছু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে আমি আবার সীমান্ত অতিক্রম করে ওপারে যাই।

শুধু খেয়ে না, মহীউদ্দীন সাহেবের কাছে সেদিন রাত্রে অমল ঘোষের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই।

প্রায় বিশ বছর আগেকার কথা। তখন পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের তিনি প্রায় ক্রীতদাসই মনে করেন। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ গর্জে উঠলেও কোটি কোটি বাঙালী ভয়ে, আতঙ্কে দিন কাটান। অন্যদিকে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চলছে পুরোদমে। সীমান্তে কড়া নজর। বেনাপোল সীমান্তের ওপর আবার বিশেষ কড়া নজর। হাজার হোক কলকাতার খুব কাছে তো! চেকপোস্টের ও-সি বাঙালী হলেও কাস্টমস-এর সুপারিনটেনডেণ্ট ছাড়াও পাঁচ-ছ'জন ইন্সপেক্টর পাঞ্জাব বা ফ্রন্টিয়ারের লোক। তাছাড়া যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন খান কখন যে নেকড়ে বাঘের মত সীমান্তের বাঙালী অফিসার ও সাধারণ কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তা কেউ জানে না! মানুষ যে এত হিংস্র ও অসভ্য হয়, তা ঐ ছোকরা ক্যাপ্টেনকে দেখার আগে বেনাপোল সীমান্তের বাঙালী অফিসার ও কর্মীরা জানতেন না।

সন্ধ্যে ঘুরে গেলেও চেকপোস্টের ও-সি ইসলাম সাহেব নিজের ঘরে বসে কাজ করছিলেন। হঠাৎ একটি কনস্টেবল সেলাম করে ওর সামনে দাঁড়াতেই উনি মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কী, কিছু বলবে?

—স্যার, একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে একটা গাছতলায় বসে সারাদিন কাঁদছে।

একটু বিরক্ত হয়েই ইসলাম বললেন, কাঁদছে তা আমি কি করব?

কনস্টেবলটি অপরাধীর মত গলার স্বর বেশ নীচু করেই বলল, ছেলেটা বোধহয় খুব দুঃখী স্যার!

ইসলাম সাহেব হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে কী যেন ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, ওর সঙ্গে আর কে আছে?

—আর কেউ নেই স্যার।

—বাড়ি কোথায়?

—স্যার, ছেলেটা শুধু কাঁদছে। কোন কথা বলছে না। তবে চেহারা দেখে মনে হয়, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছে।

ইসলাম সাহেব আবার কি যেন ভাবেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, ছেলেটি হিন্দু না মুসলমান?

—তাও বুঝতে পারছি না স্যার।

ও-সি সাহেব একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, যাও, ছেলেটাকে নিয়ে এসো।

কনস্টেবল ছেলেটিকে নিয়ে ও-সি সাহেবের ঘরে ঢুকতেই উনি একবার ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর ওকে একটু কাছে ডেকে বললেন, কী নাম তোমার?

—শ্রীঅমল ঘোষ।

—বাড়ি কোথায়?

—ফরিদপুর।

—ফরিদপুরে কোথায়?

—মাদারিপুর।

—মাদারিপুর শহরেই?

—হ্যাঁ।

—তা তুমি সারাদিন ধরে কাঁদছ কেন?

অমল বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। চাপা কান্নায় গলা দিয়ে স্বর বেরুতে পারে না।

ও-সি সাহেব আদর করে ওর পিঠে হাত দিতেই অমল উঃ, বলে প্রায় ছিটকে সরে দাঁড়ায়। ইসলাম সাহেব অভিজ্ঞ পুলিস অফিসার। উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তোমার পিঠে কী ব্যথা ?

অমল কাঁদতে কাদতেই মুখ নীচু করে শুধু মাথা নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

এতক্ষণ পর ও-সি সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে যান। কোন কথা না বলে অমলের গায়ের জামা তুলে দেখেই চমকে ওঠেন। জিজ্ঞেস করেন, কে তোমাকে এভাবে মেরেছেন ?

অমল আগের মতই মুখ নীচু করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার বাবা আর তার বউ।

ওর কথা শুনে ও-সি সাহেব না হেসে পারেন না। বলেন, তোমায় বাবার বউ তোমার কে হন ?

—আমার কেউ না।

ও-সি সাহেব হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করেন, উনি তোমার মা না ?

—না, আমার মা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছেন।

—ও !

ইসলাম সাহেবের কাছে অমলের দুঃখের দিনের ছবিটা আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যায়। উনি ওকে আর কোন প্রশ্ন না করে কনস্টেবলকে বলেন, তুমি একে আমার কোয়ার্টারে দিয়ে বলে দিও, ও থাকবে।

বিমাতা ও স্ত্রৈণ পিতার অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অমল একদিন গভীর রাত্তিরে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ও সীমাহীন অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, আমাকে বাঁচতে হবে, মানুষের মত বাঁচতে হবে।

কত নদী-নালা অরণ্য-জনপদ পার হয়ে চলতে চলতে অমল স্বপ্ন দেখে, সে কলকাতায় যাবে, লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে। আর? আর হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা আয় করে সব গরীব ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে।

ঐ স্বপ্নের ঘোরেই অমল অনাহার, অনিদ্রা ও শরীরের সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে এগিয়ে চলেছিল। যশোর শহর পার হবার পর একটা চাপা আনন্দে খুশিতে ওর মন ভরে গেল। ভাবল, কলকাতা তো আর বেশী দূর নয়, বড়জোর দু'আড়াই দিনের পথ। কিন্তু ঝিকড়গাছা পার হয়ে গদখালি-নাভারণ আসতেই রাস্তার ধারে ই. পি. আর'দের দেখে একটু ভয় পায়। ঘাবড়ে যায়। মনে মনে ভয় হয়, ওরা ধরবে না তো? তবু দুটো পা থেমে থাকে না, এগিয়ে চলে।

ও-সি সাহেবের কোয়ার্টারে বেশ কয়েক দিন কাটাবার পর অমল একদিন অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে ইসলাম সাহেবকে বলে, স্যার, আপনার দয়ায় আমি বেঁচে গেলাম কিন্তু আমাকে একটা ভিক্ষা দিতে হবে।

—কী চাই তোমার?

—স্যার, আমাকে সীমান্ত পার করে দিতে হবে।

—তোমার পাসপোর্ট-ভিসা আছে?

—না স্যার।

—তবে? তবে কী করে তোমাকে পার করে দেব?

অমল কোন জবাব দেয় না; মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েক মিনিট নীরব থাকার পর ইসলাম সাহেব বলেন, আমি কী ইচ্ছে করলেই তোমাকে পার করে দিতে পারি? কোন পাঞ্জাবী অফিসার জানতে পারলে হয়ত আমাকে ক্যান্টনমেণ্টে নিয়ে গুলি করেই মারবে।

অমল তবুও কিছু বলে না।

আবার একটু পরে ইসলাম সাহেব বলেন, অনেকে তো রাতের অন্ধকারে এদিক-ওদিক দিয়ে সীমান্ত পার হয়ে যায়। তুমি গেলে না কেন?

অমল এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, না স্যার, ওভাবে আমি যাব না।

—কেন?

—আপনার নুন খেয়ে ও কাজ করলে বেইমানী করা হবে।

অত অভিজ্ঞ পুলিস অফিসারও ঐ কিশোরের কথা শুনে চমকে ওঠেন।

এতক্ষণ নিঃশব্দে সব কিছু শোনার পর আমি প্রশ্ন করলাম, তারপর?

মহীউদ্দীন সাহেব মুখ গম্ভীর করে বললেন, ঠিক সেদিন প্রায় মাঝ রাত্তিরে যশোর ক্যান্টনমেণ্ট থেকে একদল পাঞ্জাবী অফিসার হঠাৎ এখানে হাজির হয়ে সবাইকে জানালেন, কাশ্মীর বর্ডারে বেশ গণ্ডগোল হচ্ছে। সুতরাং বেনাপোল বর্ডার দিয়ে যেন বেআইনীভাবে একটা মশা-মাছিও পারাপার না করতে পারে।

আমি চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

মহীউদ্দীন সাহেব বলেন, ভোরের দিকে আরো বেশ কিছু ই-পি-আর এসে হাজির হলো এবং এই পরিস্থিতিতে কাজকর্মের জন্যও ইসলাম সাহেবের পক্ষে ওদিকের ও-সি'র সঙ্গে দেখাশুনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল।

ওর কথা শুনে সে সময়কার পরিস্থিতি বেশ অনুভব করতে পারি।

দিন সাতেক এইভাবেই কেটে গেল।

একে শীতকাল। তারপর তখন প্রায় মাঝ রাত্তির। হঠাৎ একদল লোক সীমান্ত পার হবার জন্য ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে হাজির হতেই

ডিউটি অফিসার ভয়ে ও-সি'কে খবর দিলেন। খবর পেয়েই উনি কোয়ার্টার থেকে ছুটে এলেন।

ওদের সবাইকে একবার ভাল করে দেখে নিয়েই ইসলাম সাহেব প্রশ্ন করলেন, আপনারা এত রাত্তিরে এলেন কেন?

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বললেন, স্যার, আমাদের দেশের বাড়িতে একটা বিয়ে ছিল। বিয়ের সাত দিনের দিন হঠাৎ আমাদের পরিবারের সব চাইতে বড় ভাই মারা গেলেন। ভেবেছিলাম, তার শ্রাদ্ধ সেরে আমরা ফিরব কিন্তু ঢাকায় গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও ভিসার মেয়াদ বাড়াতে পারলাম না বলে আজই ফিরে যাচ্ছি।

ইসলাম সাহেব পাশ ফিরে এ-এস-আই'কে জিজ্ঞেস করলেন, এদের ভিসা কবে শেষ হচ্ছে?

—আজ রাত্তিরেই স্যার!

মুহূর্তের জন্য ইসলাম সাহেব কি যেন একটু ভেবে এ-এস-আই'কে বললেন, আমি একটু পরে এসে নিজেই এদের নিয়ে কাস্টমস চেক করাতে যাব।

—জী!

ইসলাম সাহেব এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে প্রথমে কাস্টমস তারপর ওপারের কাস্টমস ও চেকপোস্টে গিয়ে কথাবার্তা বলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন।

সেদিন সেই মাঝ রাত্তিরের অন্ধকারে ঐ দলকে সীমান্ত পার করে দেবার সময় অমলকেও ওপারে দিয়ে এলেন।

মহীউদ্দীন সাহেব খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সেদিন যদি কোনক্রমে জানাজানি হয়ে যেত তাহলে ইসলাম সাহেবের ভাগ্যে যে কি পুরস্কার জুটত, তা আল্লাই জানেন। একটু থেমে বললেন, যদি কোনক্রমে জানে বেঁচে যেতেন, তাহলে চাকরিটা নিশ্চয়ই যেত।

—তা তো বটেই !

মহীউদ্দীন সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, ইসলাম সাহেব তাড়াহুড়োয় যাবার সময় অমলকে বিশেষ কিছুই দিতে পারেন নি। শুধু মেয়ের গলা থেকে পাঁচ-ছ'আনা ওজনের একটা সরু হার খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ওপারের ও-সি সাহেবকে দিলেই উনি এটা বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবেন। ঐ টাকায় তোর বেশ কিছুদিন চলে যাবে।

আমি মনে মনে ইসলাম সাহেবকে প্রণাম জানিয়ে মহীউদ্দীন সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, নিত্যবাবুকে জিজ্ঞেস করলেও অমলের কথা জানতে পারবেন।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ও ছ'দিকের বর্ডারেই খুব পপুলার। সবাই ওকে ভালবাসেন। মহীউদ্দীন সাহেব একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, ভালবাসার মতই তো ছেলে ও !

আমি কয়েক মিনিট না ভেবে পারি না। তারপর জিজ্ঞেস করি, আজ অমলবাবু কোথায় গেলেন ? মাদারিপুর ?

—না, না, ও ইসলাম সাহেবের বাড়ি গেল। ছ'তিন মাস অন্তরই ও ইসলাম সাহেবকে দেখতে যায়

—আচ্ছা !

—হ্যাঁ বাচ্চুবাবু, এখন ইসলাম সাহেবই ওর আব্বা !

—সে তো একশ' বার !

মহীউদ্দীন সাহেব একটু হেসে বললেন, বোম্বেতে অমলের যে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ফার্ম আছে, তার নাম হচ্ছে ইসলাম ইণ্টারন্যাশনাল!

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ বাচ্চুবাবু, বলেছি না, অমলের মত ছেলে হয় না !

আমাদের এ দিকের কাস্টমস-এর সুপারিটেনডেন্ট মিঃ ঘোষ ও নিত্যর কাছেও অমলের কথা শুনি। ঐ হার বিক্রির টাকা দিয়েই অমল এই বর্ডার চেকপোস্টের পাশে একটা চায়ের দোকান করে। সারাদিন দোকানদারী করে সন্ধ্যের পর পড়াশুনা করে অমল হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করার পর একদিন হরিদাসপুর ছেড়ে কলকাতা চলে যায়। তারপর ধাপে ধাপে সে এগিয়েছে।

মিঃ ঘোষ বললেন, তখন আমি এই এখানেই সাব-ইন্সপেক্টর ছিলাম। তাই সবকিছু জানি। অমলের উন্নতির কথা শুনলে অনেকে বিশ্বাস করতেই চান না। কিন্তু আমরা তো অবিশ্বাস করতে পারি না।

—তা তো বটেই!

—এমন ভদ্র বিনয়ী ছেলে অন্তত আমি তো জীবনে দেখি নি।

—ভাল না হলে কী কেউ এত উন্নতি করতে পারে?

—শুধু ভাল হলেই কী জীবনে উন্নতি করা যায় বাচ্চুবাবু? মিঃ ঘোষ একটু থেমে বললেন, ও যে কি পরিশ্রমী আর কি সৎ, তা চোখে দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। উনি একটু হেসে বললেন, ওর অনেক, অনেক গুণ আছে বাচ্চুবাবু!

নিত্য বলল, তা ছাড়া ভাই ও দুদিকের বর্ডারের সবাইকে যে কি শ্রদ্ধা করে আর ভালবাসে, তা তুমি ভাবতে পারবে না। ওকে এখানকার সবাই নিজের সন্তানের মতই ভালবাসেন।

শুয়ে শুয়েও অমল আর ইসলাম সাহেবের কথাই ভাবছিলাম। ওদের দুজনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, তা নিজেই জানতে পারিনি।

ছয়

নিছক আয়তনে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ হচ্ছে আমাদের এই ভারতবর্ষ এবং স্থলে জলে আমাদের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় তেরো

হাজার মাইল। পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে বিষুবরেখা চলে গেছে তার দৈর্ঘ্য পঁচিশ হাজার মাইলও নয়। আমাদের সীমান্তের দৈর্ঘ্য এর অর্ধেকেরও বেশী। ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

এই সীমান্তের ওপারে আছে নেপাল, ভুটান, চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য সীমান্তে বেশ কয়েকটি স্থান নির্দিষ্ট আছে। তারই একটি হলো হরিদাসপুর। চলতি কথায় লোকে বলে বনগাঁ বর্ডার। ওপারে যশোর জেলার বেনাপোল।

দেশ দু'টুকরো হবার আগে বনগাঁ যশোর জেলারই অন্যতম মহকুমা ছিল। এখন সেই বনগাঁ চব্বিশ পরগনায় ঢুকেছে।

পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের মধ্যে যারা যাতায়াত করেন, তারা অধিকাংশই এই হরিদাসপুর-বেনাপোল দিয়ে যাওয়া পছন্দ করেন। এর সব চাইতে বড় কারণ কলকাতার অবস্থিতি। তাছাড়া এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা কম খরচের।

বনগাঁ স্টেশন থেকে তিন-চার টাকায় সাইকেল রিকশা হরিদাসপুর পৌঁছে দেবে। পথে বি-এস-এফ'এর ক্যাম্প ও কাস্টমস কলোনী পড়বে। তবে তার অনেক আগেই বনগাঁ শহর পিছনে পড়ে রইবে। রিকশা থেকে নামতে না নামতেই কিছু দালাল যাত্রীদের ঘিরে ধরেন, স্যার, টাকা চেঞ্জ করবেন? একটি লম্বা বংশদণ্ড দিয়ে সীমান্ত চেকপোস্টের সীমানা শুরু। এই বংশদণ্ড'র পাশেই একজন তালপাতার সেপাই সব সময় মজুত থাকেন। মামুলী চেহারা ও পোশাকের যাত্রী দেখলেই উনি বলেন, পাসপোর্ট দেখি। বাঁ দিকেই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট। ডানদিকে কাঠের খাঁচার মধ্যে সরকার অনুমোদিত মানি চেঞ্জার।

গ্রামের পাঠশালার মত আধপাকা আধকাঁচা ঘরে এই চেকপোস্ট। এক পাশে ও-সি সাহেবের টেবিল। তার একটু দূরেই জানলার

সামনে একজন এ-এস আই বাংলাদেশগামী যাত্রীদের নাম-ধাম পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি খাতায় লিখে নিয়ে পাসপোর্টে মোহরের ছাপ দেন—একজিট, হরিদাসপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট, চব্বিশ-পরগনা। ও দেশের মানুষ এ দেশে ঢোকার সময় একটা অতিরিক্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয় এবং তা হচ্ছে ভারতস্থ ঠিকানা। তবে কে যে সঠিক ঠিকানা জানান তা ঈশ্বরই জানেন।

চেকপোস্টের গণ্ডী পার হবার পর কাস্টমস কাউন্টারে সততার পরীক্ষা দেবার আগে হেলথ সার্টিফিকেট দেখবার ও দেখার নিয়ম থাকলেও ও ঝামেলা কেউই ভোগ করেন না। যাত্রীদের মত হেলথ অফিসারও সমান নির্বিকার।

ওদিকেও একই ব্যাপার, একই নিয়ম।

আপাতদৃষ্টিতে নেহাতই সাদামাটা ব্যাপার কিন্তু আসলে তা নয়। আমেরিকা-কানাডা বা নরওয়ে-সুইডেনের মত সম্পর্ক ক'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে হয় বা হতে পারে? দু'টি প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক কত মধুর ও দু'টি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান এই সীমান্ত চেকপোস্ট। সে যাইহোক সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে শুধু যাত্রীদের আসা যাওয়া ও দুটি দেশের মালপত্রের আমদানি রপ্তানি হওয়াই নিয়ম ও বিধিসম্মত কিন্তু এই সুযোগের অপব্যবহার রোধ করার জন্যই সীমান্তের দু'দিকেই দু'টি দেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

এই তো চেকপোস্টের কেদারবাবুই একটা ঘটনা বললেন।

বছর তিনেক আগেকার কথা। সেদিন মহাষ্টামী পূজা। কাস্টমস ও চেকপোস্টের অনেকেই ছুটি নিয়েছেন। চেকপোস্টে কেদারবাবু আর কাস্টমস কাউন্টারে মিঃ শ্রীবাস্তব দু'চারজন সহকর্মী নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন। তাছাড়া সেদিন যাত্রীর আসা-যাওয়াও বিশেষ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কোন যাত্রীর আসা-যাওয়া নেই দেখে কাস্টমস কাউন্টারে মিঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন কেদারবাবু। হঠাৎ

এক ভদ্রলোকের একটু চেঁচামেচি শুনেই ওরা তুজনে বাইরে এসে দেখেন, একজন সুপুরুষ ভদ্রলোক চেকপোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কনস্টেবেলকে ইংরেজীতে বলেছেন, এটা চেকপোস্ট নাকি মগের মুলুক ? চেকপোস্ট ফেলে তোমার দারোগাবাবু কোথায় স্ফূর্তি করতে গেছেন ?

ভদ্রলোকের কথা শুনেই ওরা তুজনে একটু ঘাবড়ে যান। ভাবেন বোধহয় কোন কূটনীতিবিদ বা উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার। কেদারবাবু অর্ধেক কাপ চা ফেলে রেখেই ছুটে আসেন।

—স্যার, ইওর পাসপোর্ট প্লীজ !

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্তভাবে পাসপোর্টখানা এগিয়ে দিয়েই বললেন, চটপট ছাপ দিয়ে দিন। আমার ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।

পাসপোর্টের রং দেখেই কেদারবাবু আশ্বস্ত হলেন। না, ডিপ্লোম্যাট বা হাই অফিসিয়াল না, নিছক একজন সাধারণ ভারতীয়। ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে কেদারবাবুর মেজাজ আগেই বিগড়ে গিয়েছিল কিন্তু ভয়ে কিছু বলেন নি। এবার পাসপোর্টখানা হাতে নিয়েই কেদারবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, অত তাড়াহুড়ো করার জায়গা এটা নয়।

—পাসপোর্টে একটা ছাপ মারতে কতক্ষণ লাগে ?

—চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। কখন ছাপ মারব, তা নিজেই দেখতে পাবেন।

—বাট আই অ্যাম ইন এ হারি। আমার অত্যন্ত জরুরী···

—আপনি ব্যস্ত বলে কী আমার কাজ করব না ?

কথাবার্তা বলতে বলতেই কেদারবাবু পাসপোর্টের পাতা উল্টে যান। একটু আড়াল করে পাসপোর্ট দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের মুখের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে দেখেন।

ভদ্রলোক বোধহয় ঈশান কোণে মেঘের ইঙ্গিত দেখতে পান।

একটু নরম সুরে বলেন, কাইগুলি একটু তাড়াতাড়ি করবেন। আমার খুব জরুরী কাজ আছে।

কেদারবাবু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম ?

—পাসপোর্টে তো সবই লেখা আছে।

—আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—আমার নাম ইন্দুশেখর গোরে।

—বাবার নাম ?

—আন্নাসাহেব গোরে।

—কোথায় জন্মেছেন ?

—নাগপুর।

—কবে জন্মেছেন ?

—সাতই নভেম্বর।

—কোন্ সালে ?

মুহূর্তের জন্য উনি একটু ঘাবড়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বললেন, পঁয়ত্রিশ সালে।

—ঠিক তো ?

মিঃ গোরে তাড়াতাড়ি একটু হেসে বললেন, বাবার ডায়রী দেখে তো ফর্ম ভর্তি করেছিলাম।

—আপনার মুখের আঁচিলটা কোথায় গেল ?

—ও ! একটু ঢোক গিলে বললেন, ওটা পড়ে গেছে।

—পড়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। মিঃ গোরে যেন কষ্ট করেই হেসে কথাটা বললেন।

—হঠাৎ পড়ে গেল ? কেদারবাবু শ্যেন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে পড়ে গেছে।

এবার কেদারবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি ভিতরে আসুন।

—কেন বলুন তো ?

—দরকার আছে।

কেদারবাবুর কথাবার্তা শুনে দুজন কনস্টেবল সতর্ক হয়ে গেছে। ওদেরই একজন ইশারায় ঘরের বাইরের দু'চারজনকে সতর্ক করে দিয়েছে।

মিঃ গোরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হাতের রোলেক্স ক্রনোমিটারটি খুলে হঠাৎ কেদারবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, প্লীজ হেলপ মী !

কেদারবাবু গর্জে উঠলেন, সতীশ, দরজা বন্ধ করো। চোখের নিমেষে দরজা বন্ধ হতেই কেদারবাবু একটু হেসে বললেন, একশ' তিরিশ টাকার এইচ-এম-টি এত ভাল সময় দেয় যে দশ বিশ হাজার টাকা দামের রোলেক্স ক্রনোমিটারের কোন দরকার নেই।

এক নিঃশ্বাসে এই পর্যন্ত বলার পর কেদারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ঐ লোকটা কি করেছিল জানেন ?

—কী ?

—সপ্তমীর দিন রাত্রে বোম্বের এক ফাইভ স্টার হোটেলে এক বিদেশী কাপল্‌কে মার্ডার করে সর্বস্ব লুঠ করে।

—তারপর ?

—ওর যমজ ভাই এক ট্রাভেল এজেন্সীতে কাজ করে। ঐ ভাইয়ের পাসপোর্ট নিয়ে ও ভোরের প্লেনেই কলকাতা রওনা হয়। কলকাতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের একটা জাল ভিসা যোগাড় করে পালাবার জন্য···

—বলেন কী ?

কনস্টেবল সতীশ পাশেই ছিলেন। উনি আমার দিকে তাকিয়ে

বললেন, জানেন স্যার, ও যদি মেজাজ না দেখাত তাহলে বোধ হয় পার হয়ে যেতো।

কেদারবাবু ওকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, তা ঠিক। হাজার হোক যমজ ভাইয়ের পাসপোর্ট নিয়ে যাচ্ছিল। মুখের পাশের ছোট একটা আঁচিল নিয়ে কি সব সময় আমরা মাথা ঘামাই ?

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা তো বটেই। সতীশ আবার বলেন, ওর স্যুটকেসের মধ্যে কী না ছিল! ঢাকা থেকে বিলেত-আমেরিকা যাবার টিকিট থেকে শুধু লাখখানেক টাকার ডলার ও কয়েক লাখ টাকার গহনা ছিল।

কেদারবাবু বললেন, গহনা মানে ডায়মণ্ডের কয়েকটা নেকলেস। আসলে ঐ বিদেশী ভদ্রলোক ডায়মণ্ডের বিজনেস করতেন। উনি ডায়মণ্ড-কাটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যই বোম্বে এসেছিলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাদের ডায়মণ্ড-কাটাররা তো পৃথিবী বিখ্যাত।

এতক্ষণ নিত্য কোন কথা বলেনি। কেদারবাবুর কথা শেষ হবার পর ও একটু মুচকি হাসি হেসে বলল, আরে ভাই, শুধু চোর-ডাকাত না, কত রথী-মহারথী ফলস্ পাসপোর্ট নিয়ে যাতায়াত করেন।

আমি প্রায় আঁতকে উঠি। বলি, সে কী? আমাদের দেশের বিখ্যাত লোকেরা কী করে···

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলল, না, না, আমাদের দেশের বিখ্যাত লোকদের কথা বলছি না। দিল্লীর কিছু কিছু এম্বাসীতে এমন কিছু মহাপুরুষ আছেন যাঁদের ব্রীফকেসে সব সময় ডজনখানেক পাসপোর্ট মজুত থাকে।

আমি একটু হেসে বললাম, এ কারবার তো তাদেরই সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়।

—তা তো বটেই।

—কিন্তু ওদের তো ধরার উপায় নেই   নিত্য ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, আমরা একজনকে ধরেছিলাম।

—কী করে ?

—ভদ্রলোক ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে ওদিকে গিয়েছিলেন। মাস খানেক পরে ফিরেও এলেন ঐ পাসপোর্ট নিয়ে কিন্তু ওর অনেক মালপত্তর ছিল। ভুল করে উনি একটা দড়ির ব্যাগ ফেলে বাকি সব মালপত্তর গাড়িতে তুলে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছিলেন।

—তারপর ?

—দশ পনের মিনিটের মধ্যে আরো অনেকে এসেছেন—গিয়েছেন। ভাবলাম, কেউ বোধ হয় ভুলে ফেলে গিয়েছেন। টেবিলের উপর ব্যাগটা পড়ে থাকতে দেখে হাতে তুলে নিতেই অবাক।

—কেন ?

—দেখি, ভিতরে একটা পিস্তল আর দুটো পাসপোর্ট।

—সে কী ?

—আর সে কী ? ভদ্রলোক ক্যাচ-কট্-কট্ !

সাত

সাতচল্লিশে শুধু দেশই টুকরো টুকরো হলো না, অসংখ্য পরিবারও টুকরো টুকরো হলো। ভয়ে ভীতিতে, আশঙ্কায় অথবা সদ্যসৃষ্ট স্বর্গের বাসিন্দা হবার জন্য ঘর-সংসার তুলে নিয়ে গেলেন একদিক থেকে অন্যদিকে কিন্তু সবার পক্ষে কী তা সম্ভব ?

—না।

সীমান্তের দু'দিকেই এমন হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ মানুষ আছেন, যাদের পরম প্রিয়-জনদের অনেকেই রয়েছেন সীমান্তের অপর দিকে। শ্যামা-দোয়েল-কোয়েলের ডাক শুনে আর মাটির সোঁদা গন্ধের দোষেই

বোধহয় তুই বাংলার মানুষই কেমন একটু ভাবপ্রবণ হয়। হবেই। অতি বাস্তববাদী বাঙালীও প্রিয়জনের চোখে তু'ফোঁটা জল দেখলে বা কোকিলের ডাক শুনলে অন্তত কয়েক টুকরো মুহূর্তের জন্য আনমনা হবেনই। তাই তো তারা সুখে বা তুঃখে প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভ না করে থাকতে পারেন না। পাসপোর্ট-ভিসা-চেকপোস্টের ঝামেলার চাইতে এই সান্নিধ্যের আকর্ষণ অনেক অনেক বেশী।

হরিদাসপুর-বেনাপোল দিয়ে যারা যাতায়াত করেন, তাদের বারো আনাই পারিবারিক পুনর্মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে চেকপোস্ট পার হয়ে যান।

—না, না, আব্বা, এখানে কিছু খাব না।

হামিদ সাহেব অবাক হয়ে বলেন, সে কিরে ? তোর খিদে পায় নি ?

সঞ্জিদা বলল, এখানে খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তুলা ভাই নিশ্চয়ই ইভনিং শো'র টিকিট কেটে রেখেছেন। এখন তাড়াতাড়ি চলো।

—সেই কখন বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছিস !

—তা হোক।

সত্যি, হরিদাসপুর চেকপোস্ট পার হবার পরই সঞ্জিদা আর ধৈর্য ধরতে পারে না। খুলনা থেকে কলকাতার আমীর আলি এভিন্যু মাত্র একশ' পাঁচ-দশ মাইল হলেও মনে হয় কত দূর! কিন্তু বেনাপোল ছাড়িয়ে হরিদাসপুর চেকপোস্ট পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, এই তো এসে গেছি। ইলেকট্রিক ট্রেনে তো মাত্র তু'ঘণ্টার পথ শিয়ালদ'। তারপর ট্যাক্সীতে ? বড়জোর দশ-পনের মিনিট।

বড় বোন সবিতার বিয়ের পর সঞ্জিদা গত তু'বছর ধরে এই সময় মাস খানেকের জন্য কলকাতা আসে। তার আগেও তু'এক বছর অন্তর এসেছে ছোট চাচার বাড়ি। তাই তো কলকাতা ওর কাছে ঠিক বিদেশ না।

বনগাঁ থেকে শিয়ালদ' যাবার পথে অনেক স্টেশন পড়ে কিন্তু

তাদের নাম ওর মনে থাকে না বা রাখে না। তবে জানে দমদম এলেই শিয়ালদ' নামার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করতে হয়।

একলা একলা ও আমীর আলি এভিন্যু যেতে না পারলেও এণ্টালী মার্কেট ছাড়ালেই কেমন চেনা চেনা মনে হয় সবকিছু। ট্যাক্সী সার্কুলার রোড থেকে পার্ক স্ট্রীটে ঘুরতেই ও উত্তেজিত না হয়ে পারে না। বলে, আব্বা, এসে গেছি। ঐ তো ট্রাম ডিপোর কাছে ডান দিকে ঘুরলেই ··

হামিদ সাহেব হেসে বলেন, তুই এদিকটা বেশ চিনে গেছিস, তাই না?

—শুধু এদিক কেন, নিউ মার্কেট-চৌরঙ্গী-গড়িয়াহাট, আরো কত জায়গা চিনি। সজ্জিদা চোখ দুটো বড় বড় করে হামিদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, দুলা ভাই অফিসে বেরুবার পরই তো আমি আর আপা বেরিয়ে পড়ি।

হামিদ সাহেব মেয়ের কথা শুনে হাসেন।

সজ্জিদা বলে যায়, কোনদিন নিউ মার্কেট, কোনদিন গড়িয়াহাট, কোনদিন আবার ছোট চাচির কাছে যাই। দুটো-তিনটের আগে কোনদিন আমরা বাড়ি ফিরি না। তারপর সন্ধ্যের পর আমার দুলা ভাইয়ের সঙ্গে কোনদিন সিনেমা, কোনদিন থিয়েটার দেখতে যাই।

অষ্টাদশী সজ্জিদা ভাবাবেগে, আনন্দের আতিশয্যে এসব কথা বলে যায় কিন্তু মধ্যবয়সী হামিদ চুপ করে থাকলেও তিনি মনে মনে চাপা আনন্দ ও উত্তেজনার স্বাদ অনুভব করেন। করবেন না কেন? যে কলকাতায় আসতে আজকে তার পাসপোর্ট-ভিসা লাগে, সীমান্তের দু'দিকে বাক্স-পেঁটরা খুলে দেখাতে হয়, সেই কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটেই তো ওর জন্ম। শুধু ওর কেন? ওরা পাঁচ ভাইবোনেই তো ঐ বাড়িতে জন্মেছেন।

হরিদাসপুর সীমান্ত পার হবার পর ফেলে আসা সেই সোনালী

দিনগুলোর স্মৃতিতে হামিদ সাহেবের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। কত কি মনে পড়ে ওর! বিছানায় শুয়ে শুয়ে শিয়ালদ' স্টেশনের রেল ইঞ্জিনের হুইসেলের আওয়াজ কী ভাল লাগত শুনতে! শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ফুটবল খেলা, ভাইবোনে মিলে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে যাওয়া ও এক এক পয়সার নকুলদানা খাওয়া!

সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হামিদ সাহেব আপন মনেই হেসে ওঠেন।

আরো কত কি মনে পড়ে! হরিদাসপুর চেকপোস্টের পাশেই রিকশা চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উনি যেন চোখের সামনে পুরনো দিনের কলকাতাকে দেখতে পান। সেই গ্যাসের আলো, সেই ভোরবেলায় রাস্তায় জল দেওয়া, ফিটন গাড়ি, অক্টারলনী মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা···

সেন্ট পলস্ স্কুল-কলেজের সহপাঠী কুমুদ এখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডেপুটি সেক্রেটারী। উনি হামিদ সাহেবকে বলেন, জানিস হামিদ, এখন আর সে কলকাতা নেই। সবকিছু এত বদলে গেছে যে সেসব দিনের কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়।

হামিদ সাহেব একটু ম্লান হেসে বলেন, আগে পাকিস্তানী ছিলাম, এখন বাংলাদেশী হয়েছি, খুলনায় কত বড় বাড়ি করেছি, কত দামী মোটর গাড়িতে চড়ি কিন্তু তবু কলকাতায় এসে ট্রাম দেখেই মনে হয়, লাফ দিয়ে উঠে পড়ি।

কুমুদবাবু ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

হামিদ সাহেব বলে যান, কলকাতা যে সে কলকাতা নেই, তা আমিও জানি কিন্তু তবু তো এই শহরে জন্মেছি, এখানেই তো লেখাপড়া শিখেছি। উনি মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে বলেন, তাছাড়া এই শহরের মাটিতেই তো আম্মাকে আমরা গোর দিয়েছি।

—তোর মা মারা যাবার কথা আমি জীবনে ভুলব না। সত্যি, অমন মৃত্যু আমি আর দেখি নি।

—আমার আম্মা সত্যি ভাগ্যবতী ছিলেন। আম্মাকে সাদি করার পরই আব্বার যত উন্নতি। আর আম্মা মারা যাবার এক বছরের মধ্যেই আমাদের মীর্জাপুরের বাড়ি ছেড়ে খুলনায় চলে যেতে হলো।

এই কলকাতায় এসে হামিদ সাহেবের কাছে খুলনা যেন কত দূর, কত অপরিচিত মনে হয়।

স্রোত কখনই একমুখী হয় না, হতে পারে না।

হরিদাসপুর সীমান্ত চেকপোস্ট পার হয়ে বেনাপোলের কাস্টমস কাউন্টারে মালপত্র রেখেই মধুসূদন চৌধুরী একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞেস করেন, হান্নান কী এখন ডিউটিতে নেই ?

ইন্সপেক্টরটি একবার ভাল করে বৃদ্ধ মধুবাবু ও তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখে নিয়ে বলেন, উনি একটু ব্যস্ত আছেন।

—কাইণ্ডলি ওকে একটু বলুন যে প্রফেসর চৌধুরী এসেছেন।

তরুণ ইন্সপেক্টরটি একটু চিৎকার করে বললেন, এই রশিদ, হান্নান সাহেবকে একটু ডাক দাও তো।

একটু পরেই হান্নান এসে প্রফেসর চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করতেই বৃদ্ধ অধ্যাপক ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো তোমরা ?

—আমরা ভালই আছি স্যার। আপনারা কেমন আছেন ?

প্রফেসর চৌধুরী হেসে বললেন, তুমি তো জানো আমি চিরকালই ভাল থাকি আর তোমার খালা ঠিক আম্মার মতই সব সময়···

স্বামীকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়েই ওর স্ত্রী বলেন, হান্নানের কাছে আর আমার নিন্দা করতে হবে না। ও তোমার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল করেই জানে।

কাস্টমস কাউন্টারের সবাই ওদের কথা শুনে হাসেন।

হান্নান হাসতে হাসতে বলেন, আগে কোয়ার্টারে চলুন। তারপর কথাবার্তা হবে।

প্রফেসর চৌধুরী বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলো। আয়েষার হাতে চা না খাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

হান্নান ওদের দুটো পাসপোর্ট এক বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন, ছাপটাপ মেরে পাঠিয়ে দিস। আমি স্যার আর খালাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

কে এই অধ্যাপক মধুসূদন চৌধুরী? আর কে এই হান্নান? বাইরের জগতের মানুষ তো দূরের কথা, হরিদাসপুর-বেনাপোল চেকপোস্টের কেউই জানতে পারলেন না ওদের কথা। ওদের কথা শুধু ওরাই জানেন।···

একদিন সাত সকালে এক ভদ্রলোক প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টারে এসে হাজির। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বাড়ির ভিতর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই উনি বললেন, স্যার, আমি জেলা স্কুলের একজন শিক্ষক। বড় ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় তার ফ্যামিলি আমাকেই দেখতে হয়। তাই সকাল-বিকেল ছাত্র পড়াই কিন্তু অন্যের ছেলেদের মানুষ করতে গিয়ে নিজের ছেলেদের কিছুই দেখতে পারি না।

মনসুরুদ্দীন সাহেব একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, ছোটবেলায় বড় ছেলেটা সত্যি ভাল ছিল কিন্তু এই ক'বছরে গোল্লায় গেছে।

—ও কী পড়ে?

—ম্যাট্রিক পাস করেছে কিন্তু থার্ড ডিভিসনে।

—কলেজে ভর্তি করেছেন?

—সেইজন্যই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার। উনি একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, গরীব স্কুল মাস্টারের ছেলেরা যদি লেখাপড়া না শেখে, তাহলে ··

—কাল দশটার সময় ছেলেকে নিয়ে কলেজে দেখা করবেন।

মনসুকুদ্দীন সাহেব পরের দিন ছেলেকে নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের সামনে হাজির হয়ে বললেন, ওকে শুধু ভর্তি করলেই হবে না ; আপনাকে একটু দেখতে হবে।

প্রিন্সিপ্যাল একটু হেসে বললেন, দেখতে হবে মানে ?

—এত খারাপ হয়েছে যে আপনি খুব কড়া হাতে ·

উনি হাসতে হাসতে বললেন, কোন ছেলে আবার খারাপ হয় নাকি ?

ইসাক সেদিন প্রিন্সিপ্যালের কথা শুনে শুধু অবাক হয় নি, মনে মনে খুশিও হয়েছিল।

দু'বছর পর মনসুকুদ্দীন সাহেব বিরাট এক হাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে মধুসূদনবাবুর কোয়ার্টারে এসে বলেছিলেন, আপনার দয়ায় আমার ঐ ছেলে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করল।

—খবরদার ও কথা বলবেন না। পড়াশুনা করল আপনার ছেলে, পরীক্ষা দিল আপনার ছেলে আর কৃতিত্ব হবে আমার ?

রসগোল্লার হাড়ি ফেরত দিয়ে উনি বলেছিলেন, এত সহজে আমাকে খুশি করতে পারবেন না। ইসাক যেদিন ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে এম. এ. পাস করবে, সেদিন আমি যা চাইব, আমাকে তাই দিতে হবে।

মনসুকুদ্দীন সাহেব মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সত্যি ভাবতে পারেন নি এমন দিন আসবে।

সময় স্থির থাকে নি ; আপন গতিতেই সে এগিয়ে চলেছিল। দেখতে দেখতে দিনগুলো যেন হাওয়ায় উড়ে যায়। নতুন ক্যালেণ্ডার, ডায়েরী পুরানো হয়। একের পর এক।

চার বছর পর মনসুকুদ্দীন সাহেব আনন্দে খুশিতে ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে মধুসূদনবাবুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, দাদা, গরীব স্কুল মাস্টারের জীবনে যে এমন দিন আসবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

মনসুরুদ্দীন সাহেবের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে প্রিন্সিপ্যাল

চৌধুরী বললেন, কেঁদে ভুলালে চলবে না মনসুরুদ্দীন। আমি যা চাইব, তা আমাকে দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই দেব দাদা।

—ইসাক আমার কাছেই থাকবে।

—একশ' বার থাকবে দাদা।

ইসাক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইসাক অযথা সময় নষ্ট না করে কাল থেকেই ক্লাস নেওয়া শুরু করো। আমি নরেশবাবুকে বলে দিয়েছি।

ইসাক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর জীবনদেবতার দিকে তাকাতেই মধুসূদনবাবু বললেন, ইসাক, তুমি কর্মজীবন শুরু করার আগে শুধু একটা কথাই বলব।

ইসাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাতেই উনি বললেন, Be so true to thyself as thou be not false to others. ফ্রান্সিস বেকনের এই কথাটা মনে রাখলে জীবনে কোনদিন তুমি কষ্ট পাবে না।

সেদিন বিকেলের দিকে ওদের সুপারিনটেনডেন্ট রহমান সাহেবের ঘরে বসে গল্প করতে করতে হান্নানই আমাকে মধুসূদনবাবুর কথা শোনাচ্ছিলেন। বললেন, আমরা তিন ভাইই স্যারের হাতে গড়া। আমরা বোধহয় আব্বার চাইতেও স্যারকে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করি।

আমি হাসি।

—আর আমার আব্বা-আম্মার কাছে তো স্যার স্বয়ং দেবতা। স্যারের সঙ্গে পরামর্শ না করে তাঁরা কোন কাজ করেন না।

আমি জিজ্ঞেস করি, উনি কী মাঝে মাঝেই দেশে যান ?

হান্নান হেসে বললেন, স্যার বা খালা কী কলকাতায় শান্তিতে থাকতে পারেন ?

—দেশে কী ওঁর আত্মীয়-স্বজন আছেন ?

—কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে ঠিকই কিন্তু উনি যান ওঁর গ্রামের স্কুল আর ঐ কলেজের টানে।

হান্নান একটু থেমে বলেন, যাত্রাপুরের হাইস্কুলটা উনিই প্রতিষ্ঠা করেন। আর ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তো আমার সেই বড় ভাই।

—তাই নাকি?

হান্নান হেসে বলেন, হ্যাঁ। উনি আবার একটু থেমে আবার একটু হেসে বলেন, স্যারের নাতি-নাতনীরা ওঁকে এত ঘন ঘন দেশে যেতে বারণ করলে উনি কি বলেন জানেন?

—কী?

—স্যার বলেন, ইসাক কেমন কলেজ চালাচ্ছে, তা না দেখলে চলে?

কথাগুলো বলতে বলতে গর্বে হান্নান সাহেবের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হঠাৎ উনি একটু জোরে হেসে উঠে বললেন, স্যার কিন্তু স্মাগলিংও করেন।

—তার মানে?

—কলেজের এক বুড়ো জমাদারের জন্য উনি এক থলি ভর্তি বিড়ি নিয়ে যান।

—বিড়ি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিড়ি। আমাদের দেশে তো কাগজের বিড়ি। তাই আমাদের দেশে ইণ্ডিয়ান বিড়ির দারুণ চাহিদা!

আমি হো-হো করে হেসে উঠি।

আট

কাস্টমস কলোনী সত্যি ভাল লাগল। হরিদাসপুর সীমান্ত চেকপোস্টের কলকাকলি থেকে বেশ দূরে স্নিগ্ধ গ্রাম্য পরিবেশে সুন্দর ও আধুনিক এই কলোনী। কটেজের মত ছোট ছোট কোয়ার্টার।

স্বচ্ছন্দে থাকার মত সব সুযোগ-সুবিধাই আছে। কলোনীর এক দিকে যশোর রোড। অন্য তিন দিকেই সবুজের মেলা। ভারত সরকারের নথিপত্রে কর্মচারীদের শ্রেণী বৈষম্যের উল্লেখ থাকলেও এই কলোনীর বাসিন্দাদের মধ্যে তার নগ্ন প্রকাশ নেই।

সন্ধ্যার পর সুপারিন্টেনডেণ্ট সাহেব ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে একটু জোরেই বলেন, কী বিভা, তোমাদের কী চা খাওয়া হয়ে গেছে?

তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ইন্দিরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলেন, আসুন স্যার, ভিতরে আসুন। বিভাদি এই মাত্র বাথরুমে ঢুকল।

ছোট্ট দু'খানি ঘরের কোয়ার্টার। চারজনে মিলে মিশে থাকেন। ড্রইংরুম বলে কিছু নেই। প্রয়োজনও নেই, সম্ভবও না। সুপারিন্টেন-ডেণ্ট সাহেব একটা তক্তপোশের উপর বসেই ইন্দিরাকে জিজ্ঞেস করেন, আজ কে রান্না করছে?

—রেখা।

—ও! উনি একটু থেমে জিজ্ঞেস করেন, কেয়া কোথায়?

—তেওয়ারীদা তো ডিউটিতে গিয়েছেন। তাই ও মুন্নীকে নিয়ে ঘুরছিল তো!

সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেব হাসতে হাসতে মাথা নেড়ে বললেন, তাহলে মুন্নী না ঘুমোন পর্যন্ত ও আসছে না।

ইন্দিরাও একটু হাসেন। বলেন, আমাদের ভিতরের ঘরে ঘোষদার বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। ওকে ঘুম পাড়াবার জন্যই তো বিভাদি এত দেরিতে বাথরুমে গেল।

—জয়শ্রীর কী শরীর খারাপ?

—না, না জয়শ্রী বৌদি আর ঘোষদার বোন একটু কেনাকাটা করতে বনগাঁ গেছেন বলে বাচ্চাটাকে আমাদের কাছে··

সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব হেসে বলেন, ওরা বেশ আছে। যখন তখন বাচ্চাদের তোমাদের কাছে রেখে ঘুরছে ফিরছে।

ইন্দিরাও একটু হেসে বলেন আমাদেরও এমন অভ্যাস হয়েছে যে একটা না একটা বাচ্চা না থাকলে কোয়ার্টারটা বড্ড খালি খালি লাগে।

রেখা চা নিয়ে আসেন। একটু পরে বিভাও আসেন। সবাই মিলে গল্পগুজব করে আরো পনের-বিশ মিনিট কেটে যায়।

খাকি পোশাক পরে সারাদিন এক্সপোর্ট—ইমপোর্ট কণ্ট্রোল অর্ডার আর ব্যাগেজ রুলস্-এর গায়ত্রী জপ করলেও ইন্সপেক্টর অমিত সরকার সন্ধ্যার পর প্রায় শেষের কবিতার অমিত রায় হয়ে যান—

যারা কথা বলে তাহারা বলুক,
আমি কাহারেও করি না বিমুখ,
তারা নাহি জানে—ভরা আছে প্রাণ।
তব অকথিত বাণীতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিবেদিতা বাইরের ঘরে পা দিয়েই স্বামীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে—

নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার
নীরব হৃদয়-খানিতে

কোনদিন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে কবিতা বা গান নিয়েই কাটিয়ে দেন সারা সন্ধ্যেবেলা। কোনদিন আবার অজয় ঘোষ, বিমান ব্যানার্জী, জয়শ্রী, বিভারা এলে গান-বাজনা নাটক-নভেল কবিতা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের আসর জমে ওঠে। অরূপ ঘরে ঢুকলেই উল্টোদিকে স্রোত বইতে শুরু করে!

অরূপ নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে, চাপা হাসি হেসে বলে, ওহে নন্দনকাননবাসিনী সুন্দরী, স্বামীকে নিয়ে তো মত্ত হয়ে আছ কিন্তু মহাপ্রভু আজ কী করেছেন জানো?

সবাই ওর দিকে তাকায়।

নিবেদিতা বলে, আপনি না বললে জানব কী করে ?

—ঢাকার বিখ্যাত শিল্পপতি আশরাফউদ্দীন আমেদের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ ?

—হ্যাঁ, দু'একবার শুনেছি।

—ওঁর স্ত্রী রামপুরের নবাববাড়ির মেয়ে, তা কী জানো ?

—না, তা জানি না।

—তা না জানলেও বেগম সাহেবা যে পরমা সুন্দরী, তা তো জানো ?

—না, তাও জানি না।

অরূপ একটা মোড়ায় বসতে বসতে বলে, যাই হোক আশরাফউদ্দীন আমেদ ও তাঁর ফ্যামিলির অনেকেই আমাদের এদিক দিয়ে যাতায়াত করেন, তা তো জানো ?

নিবেদিতা একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলে, অত শত না জানলেও আশরাফউদ্দীন সাহেব আপনাদের সবাইকে খুব ভালবাসেন, তা জানি।

অরূপ মাথা নেড়ে বলল, ভেরী গুড ! পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে করতে বলল, অদ্য অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় আশরাফউদ্দীন সাহেবের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আমাদের দেশে পদার্পণ করেন।

ওর কথায় অনেকেই মুখ টিপে হাসে। নিবেদিতা বলল, কত সুন্দরী. কত কুৎসিতই তো আসছে ; তাতে আমার কী ?

—তোমার কিছু ব্যাপার না থাকলে কী শুধু শুধুই এ খবর দিচ্ছি ? ও একবার ভাল করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, শুধু এই কথাটাই আপনাকে জ্ঞাত করতে চাই যে ঐ পরমা সুন্দরীর সঙ্গে শ্রীমান অমিতের ভালোবাসা না হইলেও গভীর ভাব হইয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চাপা হাসির গুঞ্জন ওঠে চারদিক থেকে. নিবেদিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ও! এই!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই!

—সুন্দরীর সৌন্দর্যসুধায় যে পুরুষ মুগ্ধ হয় না, সে আবার পুরুষ নাকি?

জয়শ্রী বলল, ঠিক বলেছ!

এই কাস্টমস কলোনীর অস্থায়ী বাসিন্দা হয়েও আমিও নানা-জনের কোয়ার্টারে ঘুরে বেড়াই। চা খাই, গল্প করি, ওদের কথা শুনি।

মেয়েদের মধ্যে কেয়াই সব চাইতে বেশী দিন এখানে আছে। কথায় কথায় আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বছরের পর বছর ধরে পোঁটলা-পুঁটলি বাক্স বিছানা খুলে দেখতে বা এটা-ওটা নিতে পারবেন না বলতে বিরক্ত লাগে না?

কেয়া একটু হেসে বলল, একঘেয়েমি বা বিরক্ত যে লাগে না, তা বলব না; তবে বৈচিত্র্যও তো আছে।

—বৈচিত্র্য মানে নানা ধরনের মানুষ দেখা তো?

—মানুষ ছাড়াও কী কম বৈচিত্র্য? কেয়া কলোনীর সামনে যশোর রোডের উপর আমার সঙ্গে পায়চারি করতে করতে বলে, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা ক'টা জিনিস দেখতে পারে বা জানতে পারে? কিন্তু এই ক'বছর কাস্টমস-এ কাজ করে আমি কত রকমের কত কি যে দেখলাম ও জানলাম, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

আমি মাথা নেড়ে বলি, তা ঠিক।

কেয়া একটু হেসে বলে, আগে জানতাম মদ বলে একটা তরল পদার্থ আছে, যা খেলে নেশা হয় কিন্তু তার বেশী কিছু জানতাম না।...

আমি একটু হেসে জিজ্ঞেস করি, আর এখন?

—এখন আমি পঞ্চাশ-ষাট রকমের হুইস্কি-ভদকা-জিন, কনিয়াক-

লিকুয়্যার-পোর্ট-শেরী ইত্যাদির নাম শুধু গড় গড় করে বলতে পারি না, কার কি রকম বোতল ও দাম, তাও মুখস্থ।

আমি শুধু হাসি।

—সত্যি বাচ্চুদা, এই হরিদাসপুর বর্ডারের কাস্টমস-এ চাকরি করতে গিয়ে সারা পৃথিবীর কত কি জানলাম আর দেখলাম। কেয়া একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এইসব দেখা জানা ছাড়াও কত রকমের মানুষ দেখি।

—তা ঠিক।

—কিছু কিছু মানুষের সঙ্গে তো আমাদের এমন ভাব হয়ে গেছে যে তারা আত্মীয়ের চাইতেও অনেক বেশী।

—তাই নাকি?

—হ্যা বাচ্চুদা। কেয়া একটু থেমে বলে, ব্যবসাদার ছাড়াও দু'দিকের বেশ কিছু মানুষই নিয়মিত এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। তাদের প্রায় সবাইকেই আমরা চিনি, আর কয়েকজন সত্যি আমাদের আত্মীয় বন্ধু হয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কেয়া এদেরই একজনের কথা আমাকে বলেছিল।

হরিদাসপুর-বেনাপোল সীমান্ত সেই ভোরবেলা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই সরগরম থাকে। আসা-যাওয়া লেগেই আছে। তবু মাঝে মাঝে কখনও-সখনও হঠাৎ একটু ঝিমিয়েও পড়ে। কোন অদৃশ্য অজানা কারণে এই নিত্য ব্যস্ত সীমান্ত দিয়ে হঠাৎ মানুষের আসা-যাওয়া থেমে যায়। দু'দিকের সীমান্তের কাস্টমস ও চেকপোস্টের সব কর্মীদের কাছেই এই অপ্রত্যাশিত অবসর বড়ই প্রিয়, বড়ই মধুর।

হবে না কেন? সরকারী অফিসে কাজ করলে নির্বিবাদে বলা যায়, আপনার ফাইল এখনও ফিনান্স থেকে আমাদের কাছে আসে নি। আপনি কাইণ্ডলি সামনের সপ্তাহে একবার আসবেন। ভদ্রলোককে

অত ঘোরাতে না চাইলে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, আপনি লাঞ্চের পর আসুন। আশাকরি, তার মধ্যে চিঠিটা তৈরী হয়ে যাবে।

সীমান্ত চেকপোস্টে এসব বিলাসিতার কোন অবকাশ কর্মীদের নেই। শুধু তাই নয়। এদের ক্যালেণ্ডারে লাল'এর স্পর্শ নেই। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জন্মদিন মৃত্যুদিন, কোন ধর্মীয় উৎসব, স্বাধীনতা-প্রজাতন্ত্র দিবস থেকে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলেও সীমান্তের কাস্টমস-ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ঝাঁপ বন্ধ হয় না। এক কথায় ছুটি বা লাঞ্চ ব্রেক বলে কোন শব্দ এদের ডিক্সনারীতে থাকে না। দেশের মধ্যে যুদ্ধ লাগলে অবশ্য সবার আগে সীমান্তের দরজায় তালা পড়ে।

যাই হোক, এমনই এক অবসরের সময় ওরা সবাই মিলে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। হঠাৎ একজন মহিলা ধীর পদক্ষেপে কাস্টমস কাউন্টারে ঢুকে হাতের ব্যাগটা নীচে রেখে একবার কেয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। কেয়া চা খেতে খেতেই হাত বাড়িয়ে বলল, পাসপোর্টটা দিন।

ভদ্রমহিলা পাসপোর্ট ওর হাতে দিয়েই বললেন, আপনারা চা খেয়ে নিন। আমি অপেক্ষা করছি।

—চা খেতে খেতেই আমাদের কাজ করতে হয়।

—আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। পাঁচ-দশ মিনিট অপেক্ষা করলে আমার কোন ক্ষতি হবে না।

এ ধরনের কথা তো কেউ বলেন না। কেয়া একটু অবাক হয়। খুশি হয়ে বলে, তাহলে আপনিও একটু চা খান।

—না, না, তার কি দরকার?

—সামান্য এক কাপ ছাড়া তো কিছু নয়, অত আপত্তি করছেন কেন?

এইভাবেই প্রথম আলাপ। দিন পনের বাদে উনি আবার দেশে ফেরার পথে সীমান্তে হাজির। সেদিনও কেয়া ডিউটিতে।

—কী, এরই মধ্যে দেশে ফিরে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, ভাই।

—কোথায় কোথায় ঘুরলেন ?

—আমি তো শুধু আজমীঢ় শরীফ আর কলকাতার জন্যই এসেছিলাম।

কেয়া চা-বিস্কুট আনতে দিয়ে আবার প্রশ্ন করে, আজমীঢ় যখন গিয়েছিলেন, তখন দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর নিশ্চয়ই দেখেছেন ?

—না ভাই; আমি আর কিছু দেখিনি।

কেয়া অবাক হয়ে বলে, সে কী ? এত কষ্ট, এত খরচ করে আজমীঢ় গেলেন অথচ দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর দেখলেন না ?

আয়েষা একটু ম্লান হেসে বললেন, ট্রেন বদলাতে হবে বলে আসা যাওয়ার পথে দু'রাত দিল্লীতে থেকেছি ঠিকই কিন্তু কোন কিছু দেখি নি।

—কেন ? কেয়া বিস্ময়ের সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ লালকেল্লা কুতুবমিনার দেখতে আসে আর আপনি দিল্লীতে দু'রাত কাটিয়েও···

আয়েষা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, না ভাই, ওসব দেখতে আর ইচ্ছে করে না।

না, কেয়া আর প্রশ্ন করে না। উচিত মনে করে না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, এই বয়সেই এমন বৈরাগ্য কেন ? কত বয়স হবে ? তিরিশ-বত্রিশ। খুব বেশী হলে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। বোধহয় অত হবে না। হয়ত বিয়েও করেননি। তাছাড়া অমন রূপ !

শুধু কেয়া না, অন্য মেয়েরাও ওর দিকে না তাকিয়ে পারে না। অতি সাধারণ একটা ছাপা শাড়ী আর সাদা ব্লাউজ। মাথায় আলতো করে বাঁধা একটা খোঁপা। না, কানে-গলায়-হাতে কোন অলঙ্কার নেই। বাঁ হাতে একটা বড় ঘড়ি। ব্যস ! আর কিছু নেই।

বাহুল্য তো দূরের কথা। তবু ওকে এমন অপরূপা মনে হয় যে দুটো চোখ টেনে নেবেই। সুন্দর ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যই এখানে। চাঁপা-চামেলী-জুঁই যেখানেই থাকুক, তাদের সৌন্দর্য-সৌরভে অন্তত মুহূর্তের জন্যও মানুষ একটু আনমনা হবেই।

কেয়া ওকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। দু'এক মিনিটের মধ্যেই কাস্টমস-এর কাজ শেষ হয়। বিদায়ের প্রাক্কালে কেয়া শুধু বলে, আবার আসবেন।

—আসব বৈকি! এখানে না এসে আর কোথায় যাব? আয়েষা একটু হেসেই জবাব দেন কিন্তু সামান্য হাসিতেও ঐ মুখে যে ঔজ্জ্বল্য কেয়া আশা করেছিল, তা দেখা গেল না। ভোল্টেজ কম থাকলে দু'শ-একশ' পাওয়ারের বালবও যেমন টিমটিম করে জ্বলে, ঠিক তেমন আর কি!

কেয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, প্রথম কয়েকবার যাতায়াত করার সময় কিছুই জানতে পারিনি। শুধু পাসপোর্ট দেখে জেনেছিলাম, উনি বহুদিন বিদেশে ছিলেন। আর উনি ডাক্তার।

—আর কিছুই জানতে পারো নি?

—না। একটু থেমে বলল, তবে ওকে দেখে এইটুকু আন্দাজ করেছিলাম, কোথায় যেন একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে কিন্তু উনি প্রকাশ করতে চান না।

দিন চলে যায়, মাস ঘুরে যায়। কত শত সহস্র যাত্রী হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে যাতায়াত করেন। ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে তাদের পাসপোর্টে ছাপ পড়ে। কাস্টমস-এর লোকজনের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা জমাতে চান। যাত্রীদের সঙ্গে অহেতুক বকবক করতে চেকপোস্ট-কাস্টমস-এর কর্মীদেরও তেমন গরজ হয় না কিন্তু কখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে বৈকি!

—আরে আপনি! কেয়া আয়েষাকে দেখেই হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ায়।

কাউণ্টারের উপর হ্যাণ্ডকাপ রেখেই আয়েষা ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন ভাই ?

—ভাল। মুহূর্তের জন্য একটু থেমেই কেয়া জিজ্ঞেস করে, আপনি ?

—খুব ভাল আছি।

কৃষ্ণপক্ষের গভীর অন্ধকার রাত্রে কোন চিরদুঃখীর বেহালায় যে কান্নার সুর ভেসে আসে, আয়েষার কথায় ঠিক তেমনি বেদনার ছোঁয়া পায় কেয়া। একবার ওর দিকে তাকায়। বোধহয় ওর বেদনার ইঙ্গিত পাবার চেষ্টা করে। না, না, অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চায় না। তাই শুধু জিজ্ঞেস করে, এবারও কী আজমীঢ় যাচ্ছেন ?

—না, ভাই, এবার শুধু কলকাতায় যাচ্ছি।

— কিছুদিন থাকবেন তো ?

কেয়ার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে উনি বলেন, শুধু কালকের দিনই থাকবো। পরশুই ফিরব।

কেয়া অবাক হয়ে বলে, সেকি ? মাত্র একদিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছেন ?

আয়েষা ঠোঁটের কোণায় ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়ে বলেন, কালকেই আমার কাজ। তারপর শুধু শুধু কী করতে থাকব ? একটু থেমে কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, তাছাড়া একলা একলা কী করব বলুন ?

কেয়া কিছু বলার আগেই উনি আবার বলেন, আপনি চলুন না আমার সঙ্গে। দু'চারদিন বেশ একসঙ্গে কাটান যাবে।

এ সংসারে সবাই কিছু কিছু মানুষের সান্নিধ্য পাবার জন্য কাঙাল। মনের এই বাসনা কখনো পূর্ণ হয়, কখনো হয় না, কখনো কেউ প্রকাশ করে, কখনো আবার অপ্রকাশিতই থেকে যায়। মনের ইচ্ছা মনের মধ্যেই চাপা থাকে। আয়েষার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সাধ কেয়ার

মনের মধ্যে নিশ্চয়ই ছিল। তাই তো সে দু'একজন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলেই দৌড়ে সুপারিনটেনডেন্ট সাহেবের কাছে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই কেয়া ঘুরে এসে বলল, আপনি যদি বিকেলের দিকে যান, তাহলে আমিও যেতে পারি। ও একটু থেমে বলল, আমিও বহুদিন কলকাতায় যাই না।

আয়েষা বললেন, আপনি যদি যান, তাহলে কেন বিকেলে যাব না? আজ রাত্তিরের মধ্যে কলকাতায় পৌছলেই হলো।

ফুল আর মালা নিয়ে তিলজলার কবরখানায় ঢোকার আগেই আয়েষা মনে মনে বললেন, আস্সালাতো ইয়া আহলুল করবে হে পবিত্র কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি ঈশ্বর শান্তি বর্ষণ করুন।

তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে ফুল আর মালায় ঢেকে দিলেন সারা কবরটা। জ্বেলে দিলেন ধূপ। হাঁটু ভেঙে বসে দু'হাত পেতে মোনাজাত করলেন কতক্ষণ। মোনাজাত শেষ হবার পরও উনি ওঠেন না। উঠতে পারেন না। নীরবে চোখের জল ফেললেন আরো কতক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে কেয়াকে বললেন, চলুন, ভাই।

কেয়া সঙ্গে সঙ্গে এগুতে পারে না। ঐখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করল, এটা কার কবর?

—আমার শত্রুর।

কেয়া কোন কথা না বলে ওর দিকে তাকাতেই উনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, যে আমার সারা জীবনের সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, যার জন্য আমাকে চিরকাল শুধু চোখের জল ফেলতে হবে, সে শত্রু না?

কেয়া আর কোন প্রশ্ন করে নি কিন্তু মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল ওর মনের ব্যথা ও ভালবাসার গভীরতা।

তিলজলা কবরখানা থেকে ফেরার পরও বিশেষ কোন কথা হয় নি ; তবে সেদিন রাত্রে আর আয়েষা না বলে পারে নি।—ফাইন্যাল এম. বি. বি এস-এ রেজাল্ট ভালই হলো। তাছাড়া সার্জারীতে একটা গোল্ড মেডালও পেলাম। আয়েষা একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, আর ঐ গোল্ড মেডাল পাওয়াই আমার কাল হলো।

—কেন ?

—কেন আবার ? আমাকে এফ. আর. সি. এস. পড়াবার জন্য সবাই মেতে উঠলেন।

সত্যি আয়েষার বিলেত যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না। হাজার হোক বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। ওদের ছেড়ে অত দূরে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ করিম পর্যন্ত এমন করে বললেন যে আয়েষা অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে রাজী হলো। তারপর একদিন অপরাহ্ন বেলায় ঢাকা থেকে রওনা হয়ে করাচী-রোম-প্যারিস ডিঙিয়ে লণ্ডন হাজির হলো।

সময় তো কোন কারণেই অপেক্ষা করতে জানে না, পারে না। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল কত দিন কত মাস। আয়েষা সত্যি সত্যি একদিন এডিনবরা থেকে এফ. আর. সি. এস. হয়।

রেজাল্ট বেরুবার পরদিন সকালেই ডাঃ ম্যাক্সওয়েল ওকে বললেন, নো, নো, আয়েষা, আমি এখনই তোমাকে ঢাকা ফিরতে দেব না। তুমি অ্যাট লিস্ট বছর দুই আমার সঙ্গে কাজ করবে।

পৃথিবী বিখ্যাত অত বড় সার্জেনের এমন আমন্ত্রণে আয়েষা নিজেকে ধন্য মনে করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার জন্য মনপ্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

—লুক হিয়ার আয়েষা, আমি ডেফিনিটলি জানি বছর দুয়েক আমার সঙ্গে কাজ করলে তুমি রিয়েলি আউটস্ট্যাণ্ডিং সার্জেন হবে।

আয়েষা শুধু বলেছিল, অ্যাজ ইউ প্লীজ স্যার !

ডাঃ ম্যাক্সওয়েল দু'হাত দিয়ে ওর ডান হাতটা চেপে ধরে বলছিলেন, আমি জানতাম, তুমি আমার রিকোয়েস্ট টার্ন ডাউন করবে না।

লণ্ডনের অন্যতম প্রাচীন ও বিখ্যাত সেন্ট টমাস হাসপাতালে আয়েষার জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়।

আয়েষা খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেয়াকে বলল, জানো ভাই, ঐ লণ্ডনে এসেই আমার সর্বনাশ হলো।

—কেন ?

—বাঙালীদের নববর্ষ অনুষ্ঠানে কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার পরই একজন ইয়াংম্যান আমাকে এসে কী বলল জানো ?

—কী বললেন ?

ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়েও যেন ঈষৎ সূর্যরশ্মি দেখা দেয়। আয়েষা একটু হাসে। বোধহয় সেদিনের স্মৃতি রোমন্থন করেও একটু সুখের পরশ অনুভব করে।

—শুনলাম ডাঃ ম্যাক্সওয়েলের আণ্ডারে সেন্ট টমাস হসপিট্যালে কাজ করছেন ?

—হ্যাঁ।

উনি আয়েষার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, আল্লা আর কি কি গুণ আপনাকে দিয়েছেন বলতে পারেন ?

ওর কথায় আয়েষা একটু না হেসে পারে না। জিজ্ঞেস করে, তার মানে ?

—এমন রূপ যে তাকাতে ইচ্ছে করে না, এমন বিচ্ছিরি গান গাইলেন যে কেউ হাততালি দিল না, তার উপরে হাতুড়ে ডাঃ ম্যাক্সওয়েলের জুনিয়র !

যে বাঙালী ছেলেমেয়েরা দেশে থাকতে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে না, তারাই বিদেশে গিয়ে কত পাল্টে যায়। যাবেই।

পরিবর্তিত সামাজিক পরিবেশে এই পরিবর্তন নিতান্তই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিতও। তাই ওর কথায় আয়েষা বিস্মিত হয় না। তবে মনে মনে ভাবে, এত মানুষ গান শুনলেও ঠিক এই ধরনের অভিনন্দন তো আর কেউ জানালেন না।

কেয়াকে অত্যন্ত আপনজন ভেবেই আয়েষা বলেন, বিশ্বাস করো কেয়া, সেদিনেরআগে কোনদিন কখনও এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি, কাউকে ভালোবাসি বা এমন কাউকে দেখিনি যাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করেছে। সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে আমি রশীদের ভালোবাসায় ভেসে গেলাম।

কেয়া একটু হেসে বলল, কোন না কোনদিন তো মানুষের জীবনে বাঁধ ভাঙবেই ভাই।

—তা ঠিক, কিন্তু আগে তো তা ভাবতাম না।

—তারপর ?

আয়েষা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বেশীদিন না, বছর দেড়েক মাত্র। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই কেটে গেল।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্র হয়েও রশীদ যে এমন গান পাগল হবে, তা আয়েষা ভাবতে পারে নি। পার্লামেণ্ট হিল-এ বসে অনেকক্ষণ অনেক কথা বলার পর রশীদ আয়েষার একটা হাত আলতো করে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, জানো বেগম, আমি কী স্বপ্ন দেখি ?

—কী ?

রশীদ একটু চুপ করে থাকে। তারপর সবুজের মেলায় দৃষ্টি ছড়িয়ে প্রায় আনমনেই বলে, আমি মারা যাবার পাঁচ-দশ মিনিট পর তুমি মারা যাবে।

আয়েষা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ এ কথা বলছ কেন ?

—কেন আবার ? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তখন মরতে তো হবেই। রশীদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কিভাবে বেঁচে থাকব, তা যদি ভাবা যায়, তাহলে মারা যাবার বিষয়েই বা ভাবতে বাধা কী ?

—কিন্তু তুমিই বা আগে মরবে কেন আর আমিই বা তার পাঁচ-দশ মিনিট পর মরব কেন ?

—কেন আবার ? মরবার সময় তোমার গান শুনব না ? রশীদ নির্বিকারভাবে বলে।

আয়েষা ওর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। বিস্মিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যখন মারা যাবে, তখন আমি গান গাইব ?

—হ্যাঁ, বেগম, আমি মারা যাবার সময় তুমি গাইবে. 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে'।

—বাদশা, তুমি একটা বদ্ধ পাগল !

বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণ সন্ধ্যার আকাশে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতের আলোর মত আয়েষার মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা একবার যেন উঁকি দেয়, বলে, সত্যি কেয়া, বাদশা একটা আস্ত পাগল ছিল। এক একদিন কী বলতো জানো ?

কেয়া মুখে কিছু বলে না, শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বলতো, বেগম, আজ কোন কথা বলব না, শুধু তোমাকে প্রাণভরে দেখব। আবার কতদিন ও গান শোনার পর কিছু খাওয়া-দাওয়া না করেই ঘুমিয়ে পড়তো।

—.কন ?

—কেন ? ও বলতো, রবি ঠাকুরের এইসব গান শুনলে এমন মন ভরে যায় যে আর খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছই করে না।

—উনি রবীন্দ্রনাথের খুব ভক্ত ছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ, ভাই। আয়েষা ওর ক্ষণস্থায়ী বসন্তের স্মৃতি রোমন্থন করে প্রচ্ছন্ন গর্বের হাসি হেসে বলে, বাদশা তোমাদের কলকাতার

প্রেসিডেন্সী কলেজের অত্যন্ত নামকরা ছাত্র ছিল। তাছাড়া এম. এ-তে সেবার ও একাই ফার্স্ট ক্লাস পায়। এল-এস-ই-তে ভর্তি হবার পর অবসর সময় শুধু সঞ্চয়িতা পড়েই কাটাত।

কেয়া একটু হাসে।

—হাসছ কী ভাই? আমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে ঐ বিদেশে সঞ্চয়িতাই ছিল ওর একমাত্র বন্ধু। মদ তো দূরের কথা, বাদশাকে কোনদিন একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতে দেখি নি।

আয়েষা একটু থেমে বলে, ওর দেড় বছর বয়েসের সময় ওর আব্বা মারা যান। আম্মা অনেক দুঃখে কষ্টে ওকে বড় করেন। তাই তো আম্মা দুঃখ পান, এমন কোন কিছু ও করতো না কিন্তু··

আয়েষা হঠাৎ থেমে যায়। মুখ নীচু করে কি যেন ভাবে। কেয়াই প্রশ্ন করে, কিন্তু কী?

আয়েষা মুখ না তুলেই মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে, ছোটবেলা থেকে আম্মাকে কোনদিন কোন ব্যাপারে দুঃখ দাও নি বলেই বোধহয় এক আঘাতেই সব পাওনা মিটিয়ে দিলে; তাই না?

অনেকক্ষণ কেউই কোন কথা বলে না। বোধহয় এইভাবেই দশ পনের মিনিট কেটে যায়। তারপর কেয়া জিজ্ঞেস করে, আম্মা কোথায় আছেন?

—তিলজলার কবর থেকে ফেরার পর আম্মা আর বেনেপুকুরের বাড়িতে ফিরে যান নি।

—আর ফিরে যান নি?

এবার আয়েষা মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, না ভাই, আম্মা আজো ফিরে আসেন নি। খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আম্মা নিশ্চয়ই ছেলের কাছেই চলে গেছেন, নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি শুধু আমি।

হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে দু'দেশের কত অসংখ্য নারী পুরুষ

যাতায়াত করেন কিন্তু তাদের মনের কথা, প্রাণের দুঃখের হদিস পায় না চেকপোস্ট কাস্টমস-এর কর্মীরা। সম্ভবও নয়। সুখ দুঃখের কথা জানাবার বা জানবার গরজই বা কার হয়?

কদাচিৎ কখনও ব্যতিক্রম ঘটে বৈকি! হাজার হোক সবাই তো মানুষ!

যাত্রীদের মত চেকপোস্ট-কাস্টমস-এর লোকজনদেরও তো হৃৎপিণ্ড ওঠা-নামা করে। সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসা বিরহ বেদনার অনুভূতি তো সব মানুষেরই আছে। রক্ত মাংসের দেহ তো এর ঊর্ধ্বে যেতে পারে না!

কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছিল। দুজনেই শুয়ে পড়ে। মুখোমুখি শুয়ে থাকলেও কেউ কোন কথা বলে না, বলতে পারে না। নিশুতি রাতের কোলে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

হঠাৎ কী কারণে যেন কেয়ার ঘুম ভেঙে যায়। বারান্দা থেকে ভেসে আসে—

জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে ··

না. আয়েষা আর পারে না, হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে, বাদশা, আমাকে তুমি কাছে টেনে নাও লক্ষ্মীটি! আমি আর পারছি না বাদশা!

কেয়া এক চুল নড়তে পারে না। সাহস হয় না। প্রাণহীন মর্মর মূর্তির মত বিছানায় বসে বসেই শুধু চোখের জল ফেলে।

নয়

অধিকাংশ মানুষই মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে অরণ্য-পর্বত-সমুদ্রের কাছে ছুটে যায় শান্তির আশায়. আনন্দের লোভে, বৈচিত্র্যের

সন্ধানে। কিন্তু মানুষের কাছে যে শান্তি, যে আনন্দ ও বৈচিত্র্য কখনও কখনও পাওয়া যায়, তা কি অন্যত্র সম্ভব ?

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে মৌনী হিমালয়, আকাশচুম্বী বনানী, অশান্ত দুরন্ত সমুদ্র নিশ্চয়ই এক একটি বিস্ময় কিন্তু সব বিস্ময়ের শেষ কী মানুষ না ? আমাদের আশেপাশেই চেনা, অচেনা মানুষই তো পরম বিস্ময়।

লণ্ডন না, নিউইয়র্ক না, রোম, প্যারিস মস্কোও না, দিল্লী বা হাতের কাছের করাচীতেও না, এই হরিদাসপুর বেনাপোল সীমান্ত চেকপোস্টের দু'একটি রাত কাটিয়ে সেই চিরসত্যকে আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

বাংলাদেশ যাবার সময় নিত্য যখন আমাকে ফেরার পথে এখানে কয়েকদিন কাটাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তখন প্রস্তাবটি বিশেষ লোভনীয় মনে হয় নি। বোধহয় মনে মনে একটু হাসিও পেয়েছিল। ভেবেছিলাম,একি দার্জিলিং, না ওটি বা নৈনিতাল যে নিত্য এমন করে আমন্ত্রণ করছে ?

মনে মনে ইচ্ছা অনিচ্ছার দোলা খেতে খেতেই বেনাপোলের ওসি সাহেবের কাছে পাসপোর্ট ছাপ লাগাবার জন্যই গিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাসপোর্টের ছাপকে ম্লান করে মনের ছাপই অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সীমান্তের পাশে দুটি দিন কাটাবার পর আজ মনে হচ্ছে, এই ত এলাম। মাত্র এই দুটি দিনের মধ্যেই কী সীমান্তের দু'দিকের খাকি পোশাক পরা মানুষগুলোকে ভালবেসে ফেলেছি ?

জানি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, এদের সান্নিধ্য আমার ভাল লাগছে। এদের ছেড়ে যেতেও ঠিক উৎসাহ বোধ করছি না। একেই কি ভালবাসা বলে ? নাকি বন্ধুত্বের লোভ, সান্নিধ্যের মোহ ?

নিত্য এই দু'দিন আর ওদের ব্যারাকে থাকেনি; ডিউটির

সময়টুকু ছাড়া আমার সঙ্গে থাকারই চেষ্টা করেছে। রাত্রে আমার সঙ্গেই কাস্টমস কলোনীর গেস্ট হাউসে থাকে। ছুটো খাটে মুখোমুখি শুয়ে আমরা কত গল্প করি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিত্যকে চুপ করে বসে থাকতে দেখেই জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো? সকালে উঠেই কী এত ভাবছ?

—ভাবছি জয়ন্তীর কথা।

—জয়ন্তীর কথা?

—হঠাৎ ওর কথা ভাবছ কেন?

ও আগের মত গম্ভীর হয়েই বলল, পাঁচ সাত তারিখের মধ্যেই ফিরবে বলেছিল কিন্তু··

নিত্য কথাটা শেষ না করেই কি যেন ভাবে।

আমিও জয়ন্তীর কথামতই সাত তারিখে এসেছি। ও না বললে হয়ত ছু'একদিন এদিক ওদিক কাটিয়ে আসতাম। মনে মনে কোন স্বপ্ন না দেখলেও ওর সান্নিধ্যের লোভ নিশ্চয়ই ছিল। এই ছু'দিন নানাজনের সান্নিধ্যে সব সময় ওর কথা মনে করার সুযোগ না পেলেও বার বার বহুবার ওর কথা ভেবেছি। ভাবতে ভাল লেগেছে। না ভেবে পারিনি।

মনে মনে কত কি ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম প্রায় নির্জন যশোর রোডের আলোয় ছায়ায় আমরা ছুজনে কত ঘুরব, কত কথা বলব আর শুনব। হয়তো আরো কিছু ভেবেছিলাম।

না, না, ভালবাসিনি কিন্তু শীতের আগে হেমন্তের শেষে শিশির ভেজা সকালে যেমন সামান্য শিহরণ অনুভূত হয়, অনেকটা সেই রকম চাপা ভাল লাগার ক্ষীণ অনুরণন বোধহয় মনের এক নিভৃত পল্লীতে জেগে উঠেছিল।

ওর মধ্যে কার যেন একটা প্রতিচ্ছবি, কোন এক হারিয়ে যাওয়া

স্মৃতির এমন প্রতিবিম্ব দেখেছি যে তারই আশায় কী সোনার হরিণের পিছনে আমার মন ছুটেছে ?

মনের মধ্যে যাই হোক, আমি কখনও কিছু প্রকাশ করিনি, করা সম্ভব নয়। তাই তো একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেই নিত্যকে বললাম, হাজার হোক বাবা-মার কাছে গেছে। কবে ফিরবে, তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে ?

—না, না, ও সাত তারিখেই ফিরবে বলছিল। নিত্য একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাছাড়া ও জানে, আমি একজনের খবরের জন্য বসে আছি।

এবারও যেন নিত্য পুরো কথাটা বলল না। মনে হলো, কিছু কথা ওর মনের মধ্যেই লুকিয়ে রইল। আমিও ওকে কোন প্রশ্ন করলাম না।

সকালবেলায় নিত্য কোনদিনই গল্পগুজব করার বিশেষ সময় পায় না। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করার জন্য দু'দিনই সকালে উঠতে দেরি হয়েছে। তাই আজকেও ও তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চেকপোস্টে চলে গেল।

নিত্য চলে যাবার পর একটা সিগারেট শেষ করার আগেই অমিত আর নিবেদিতা হাসতে হাসতে আমার ঘরে ঢুকল। আমি ওদের দেখেই প্রশ্ন করি, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দাদার কথা মনে পড়ল ?

অমিত বলল, আজ থেকে তো আমার নাইট ডিউটি শুরু। তাই বাড়িতে বসে না থেকে আপনার এখানে চলে এলাম।

নিবেদিতা ফ্লাস্ক ভর্তি চা এনেছিল। ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, আপনাকে তো রোজ রোজ পাব না, তাই ভাবলাম, একটু বিরক্ত করে আসি।

—আমি সকাল থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে বিরক্ত করছি। তাতেও কী তোমার আশ মেটে নি ?

নিবেদিতা আমার হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, আপনার বিরক্ত করার দৌলতে তবু আমরা একঘেয়েমি থেকে একটু মুক্তি পেয়েছি।

অমিত বলল, ঠিক বলেছ।

চা খেতে খেতে আমরা তিনজনে কথা বলি। আমার আর অমিতের পেয়ালা খালি হতেই নিবেদিতা আবার ভরে দেয়। ঐ পেয়ালার চা শেষ হতে না হতেই একটা টিফিন বক্স আর ফ্লাস্ক হাতে নিয়ে রেখা নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই তো ভারী স্বার্থপর! আমাকে না ডেকেই নিজের বরকে নিয়ে দাদার কাছে চলে এলি?

অমিত বলল, দোষটা ওর নয়, আমার। আমিই ওকে···

রেখা টেবিলের উপর টিফিন বক্স আর ফ্লাস্ক রাখতে রাখতে বলল, সে আমি জানি। আপনার সংসর্গে যে নিবেদিতা দিন দিন খারাপ হচ্ছে, তা কী আমরা জানি না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দুঃখ করো না রেখা। আমার সংসর্গে তোমরা সবাই খারাপ হয়ে নিবেদিতার সমান সমান হয়ে যাবে।

ওরা তিনজনে হাসতে হাসতে প্রায় একসঙ্গেই বলে, না, না, দাদা, আপনি কাউকেই খারাপ করবেন না।

রেখার আজ ছুটি। তাই সকালবেলাতেই আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে। ওরই মধ্যে চিড়ের পোলাও আর একবার চা হয়ে যায়। ডিউটিতে যাবার পথে অরূপ শাসিয়ে যায়, বাচ্চুদা, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত আমি আর আপনি দরজা বন্ধ করে গল্প করব। কোন আলতু-ফালতু ছেলেমেয়ে সেখানে ঢুকতে পারবে না।

রেখা হাসি চেপে বলল, ঠিক বলেছ অরূপদা! নিবেদিতার মত আজেবাজে মেয়েকে আমাদের আড্ডায় ঢুকতে না দেওয়াই উচিত।

—থাক, থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। কথাটা শেষ করতে না করতেই অরূপ ঘরের বাইরে পা বাড়ায়।

আমাদের আসর আবার জমে ওঠে। কোথা দিয়ে যে একদেড় ঘণ্টা সময় পার হয়ে যায়, তা আমরা কেউই টের পাই না। হঠাৎ হাসতে হাসতে নিত্যকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অবাক হয়ে যাই। সকালবেলায় যাকে গম্ভীর মুখে অফিস যেতে দেখলাম, তার মুখে এত হাসি দেখে অবাক হবো না? আমি কিছু বলার আগেই ও পিছন ফিরে বলল, দেখুন, দেখুন, বাচ্চু কি রকম আড্ডা জমিয়েছে।

ঘরের দরজায় পা দিয়েই জয়ন্তী এক পলকের জন্য আমার দিকে তাকিয়েই নিত্যকে বলল, আপনার বন্ধু এখানে আছেন, তা তো এতক্ষণ বলেননি?

—সরি।

যাবার দিনই অমিতের সঙ্গে জয়ন্তীর পরিচয় হয়েছিল। তাই অমিত নিবেদিতা আর রেখার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়। রেখা সঙ্গে সঙ্গে ওকে এক কাপ চা দিয়েই বলে, চিড়ের পোলাও ফুরিয়ে গেছে বলে দিতে পারলাম না বলে রাগ করবেন না।

এবার জয়ন্তী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, বেশ সুখেই আছেন দেখছি।

—আপনি ছিলেন না বলেই সুখে ছিলাম। ভয় নেই, আজ দুপুরের ট্রেনেই পালাচ্ছি।

নিত্য চা খেতে খেতে বলল, আজকে তোমাদের কাউকেই ছাড়ছি না। কাল সকালের ট্রেনে দুজনেই এক সঙ্গে চলে যেও।

জয়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে ওকে বলল, আমি না হয় আপনার মেয়ের খবর এনে দিয়েছি বলে খাতির পেতে পারি কিন্তু ওকে আটকাচ্ছেন কেন?

আমি জয়ন্তীর কথা শুনে অবাক হয়ে নিত্যর দিকে তাকিয়ে বলি, তোমার মেয়ের খবর উনি আনলেন কী করে?

নিত্য জবাব দেবার আগেই জয়ন্তী ওকে বলেন, সে কী? আপনি আপনার বন্ধুকেও মেয়ের কথা বলেন নি?

নিত্য একটু লজ্জিত হয়েই বলে, না, বলা হয় নি।

জয়ন্তী বললেন, থাক, আপনাকে আর বলতে হবে না, আমিই ওকে বলব।

ক'দিন ধরেই দিনরাত বৃষ্টি হচ্ছিল। শনিবার বিকেলের দিকে সেই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল ঝড়। সীমান্তের দু'দিকেই যে কত বড় বড় গাছপালা ভেঙে পড়ল তার ঠিক ঠিকানা নেই। আশেপাশের গ্রামের অধিকাংশ কাঁচা বাড়িরই চালা উড়ে গেল। বহু পাকা বাড়িরও কম ক্ষতি হলো না।

চেকপোস্টের শিবুবাবু তিন সপ্তাহ পর গত বৃহস্পতিবার বাড়ি গিয়েছেন। অফিসের কাজেই এস-আই পৃথ্বীশবাবুকে শুক্রবার সকালে কলকাতা পাঠাতে হয়েছে। ওদের দুজনেরই শনিবার বিকেলের মধ্যে ফেরার কথা কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের কোন পাত্তা নেই।

সন্ধ্যে ঘুরে যাবার পর এ-এস-আই নিরঞ্জনবাবু নিত্যকে বললেন, স্যার, ওদের দুজনের কেউই তো এখনও এলেন না।

নিত্য একটু চিন্তিত হয়েই বলল, হ্যাঁ, তাইতো দেখছি।

—মনে হয়, এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ওরা ফিরতেও পারবেন না।

—কোথাও হয়ত তার-টার ছিঁড়ে গেছে। তাই ট্রেন চলছে কিনা, তাই বা কে জানে!

—তাও হতে পারে স্যার!

ঠিক এমন সময় খুব জোরে বাজ পড়তেই আলো নিভে গেল। নিত্য বলল, বোধহয় বনগাঁ শহরের কাছাকাছিই বাজ পড়ল। কার সর্বনাশ হলো। কে জানে।

কনস্টেবলরা সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠন জ্বেলে দেন। নিরঞ্জনবাবু এবার বলেন, স্যার, ওরা দুজনের কেউই যদি না আসেন তাহলে রাত্রে কী আমরাই থেকে যাব?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই দেব। এবার ও একটু হেসে বলে, রাত্রে

আপনারা ডিউটি দিলে সকালেই আপনাদের হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

কিছুক্ষণ পর নিত্য একবার ওপারে গিয়ে চেকপোস্ট ও-সি সাহেব ও কাস্টমস্‌'এর সবাইকে বলে এলেন, শিববাবু আর পৃথ্বীশবাবু ফিরে আসেন নি, বলে রাত্রে আমিই ডিউটিতে থাকব। মনে হয় না, এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কেউ আসবে। তবু ভাই, আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন।

ওরা সবাই ওকে সব রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বললেন, কোন পাগল ছাড়া আর কেউ আজ ঘর থকে বেরুবে না।

নিত্য হাসতে হাসতে বলে, পাগল এলে তো আমাদের কাজ আরো বেড়ে যাবে।

নিত্য খেয়েদেয়ে ডিউটিতে আসার পর ঝড়ের বেগ সামান্য একটু কমলেও আরো জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। ঘরের দরজা আগেই বন্ধ ছিল কিন্তু এবার জানালা খুলে রাখাও অসম্ভব হয়ে উঠল। টেবিলটা আরো খানিকটা দূরে সরিয়ে রথীন বললেন, স্যার, জানালা দিয়ে বড্ড বেশি জল আসছে।

—কী আর করা যাবে? জানালা বন্ধ করলে তো কিছুই দেখা যাবে না।

কনস্টেবল রথীন একটু হেসে বললেন, স্যার, আজকে জানালার সামনে দিয়ে কেউ গট গট করে হেঁটে গেলেও আমরা তাকে দেখতে পাব না।

নিত্যও হাসে। বলে, তা ঠিক।

রাত সাড়ে-দশটা-এগারোটা নাগাত বাপ্পা কোনমতে এক মগ ভর্তি চা পৌঁছে দিয়েই বলল, স্যার, ঘরে এত জল পড়ছে যে আর চা তৈরী করা সম্ভব হবে না।

—ঠিক আছে। কি আর করা যাবে।

রাত এগিয়ে চলে। ঝড়-বৃষ্টির মাতলামিও সমান তালে চলতে থাকে। নিত্য চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ছটো পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানে। ছজন কনস্টেবল চুপচাপ বসে বসে ক্লান্ত হয়। মাঝে মাঝে একটু ঝিমুনিও ধরে। সময় যেন কাটতে চায় না।

তবু সময় এগিয়ে চলে।

লণ্ঠনের আলোয় একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নিত্য একটু জোরেই বলে, কী রথীন, ঘুমুলে নাকি? মোটে তো পৌনে বারোটা বাজে!

—না স্যার, ঘুমোই নি।

—আলো থাকলে তবু একটু গল্পের বই-টই পড়া যেতো।

—হ্যাঁ, স্যার।

অন্য কনস্টেবলটি বললেন, পঞ্চার দোকানটা খোলা থাকলে তবু একটু চা পাওয়া যেতো।

নিত্য একটু হেসে বলে, কপাল যখন মন্দ হয়, তখন এইরকমই হয়।

বড় জোর আধঘণ্টা হবে। নিত্য একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ রথীনের চিৎকার শুনেই ও লাফ দিয়ে উঠল। চার ব্যাটারীর তিনটে টর্চের আলোর সামনে মেয়েটি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু কে একজন যেন ঐ অন্ধকারের মধ্যেই দৌড়ে পালাল।

জয়ন্তী একটু থামে। একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর বলে, আপনার বন্ধু এক লাফে মেয়েটির সামনে হাজির হতেই ও হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ওর ছটো পা জড়িয়ে ধরল…

…আপনি আমাকে বাঁচান। আপনি আমার আব্বু, আপনি, আমার আম্মা! আপনি আমাকে বাঁচান।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর নিত্য বলল, সত্যি বাচ্চু, এমন নিষ্পাপ করুণ মুখ আমি জীবনে দেখিনি।…

জয়ন্তী বললেন, ঠিক বলেছেন। আমিও ওকে না দেখলে বিশ্বাস

করতাম না। এবার উনি নিত্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, সেদিন আপনি রাবেয়াকে না বাঁচালে ওর কপালে যে কি দুঃখ ছিল, তা ভগবানই জানেন।

এবার আমি প্রশ্ন করি, সেদিন রাত্রে ওর কী হয়েছিল?

নিত্য বেশ গম্ভীর হয়েই বলে, ভাই, আমাদের এইসব দেশে সরল মেয়েদের সর্বনাশ করার লোক কী কম? ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই আবার বলে, ও হারামজাদাটাকে তো ধরতে পারলাম না কিন্তু আম্মার কাছে সব শুনে মনে হলো, ও একটা অতি বদমাইশ স্মাগলারের খপ্পরে পড়েছিল।

—তাই নাকি?

—তাই তো মনে হয়।

—কিন্তু ওরা ওভাবে পালাচ্ছিল কেন?

—ও হতচ্ছাড়ার একটা ইণ্ডিয়ান পাসপোর্ট ছিল। সেই পাসপোর্ট দেখিয়েই ও বেনাপোল চেকপোস্ট পার হয় কিন্তু আম্মার তো পাসপোর্ট ছিল না।

—ও!

—ও আম্মাকে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রেখে ওপারের চেকপোস্ট-কাস্টমসএর কাজ সেরে নেয়। চেকপোস্ট-কাস্টমসএর কেউ ভাবতেও পারেনি ওর সঙ্গে আর কেউ আছে।...

—তাছাড়া ঐ দুর্যোগের রাত্তির।

—হ্যাঁ; তাই তো ওরা কেউ বাইরের দিকে নজর দেয় নি। নিত্য একটু থেমে বলে, তাছাড়া সে রাত্রের যা অবস্থা ছিল, তাতে বাইরে কেউ থাকলেও কিছুই দেখতে পেতো না।

আইন বলে, অমনভাবে কেউ কোন দেশে ঢুকলে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। থানা পুলিস-হাজতের হুজ্জোত পার হবার পর শুরু হবে কোটকাছারির পর্ব। তারপর লাল উঁচু পাঁচিল দেওয়া সরকারী

অতিথিশালায় কিছুকাল সরকারী আতিথ্য উপভোগের পর একদিন ওপারের পুলিসের হাতে তুলে দিতে হবে। যারা চুরি করে যাতায়াত করেও ধরা পড়ে না, তাদের কথা আলাদা কিন্তু ধরা পড়লেই এই দীর্ঘ নরক যন্ত্রণা!

না, চেকপোস্টের ও-সি হয়েও নিত্য আইন মানতে পারে নি। একে কিশোরী, তারপর ঐ নিষ্পাপ করুণ দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে নিত্য ভুলে গিয়েছিল ও চেকপোস্টের ও-সি। আইন-কানুনের ধারা-উপধারার কথা মুহূর্তের জন্যও মনে আসে নি। রাবেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর বার বার শুধু একটা কথাই মনে হলো, মেয়েটা বেঁচে থাকলে বোধহয় এর মতই সুন্দর, এর মতই বড় হতো।

আপনি আমায় মারবেন না, আপনি আমায় জেলে দেবেন না। আব্বা, আপনি আমায় বাঁচান।

ওর চোখের জল দেখে নিত্যর চোখেও জল এসেছিল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, তোমাকে আমি মারব কেন মা? আমি না তোমার আব্বা? তুমি আমার আম্মা?

চেকপোস্টের ও-সি হয়েও নিত্য সেই মহাদুর্যোগের রাত্রিতেই চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে হাজির হয়েছিল ওপারের ও-সি সাহেবের কোয়ার্টারে। তারপর ওর দুটি হাত ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, দাদা, আমার মেয়েকে আপনি বাঁচান। আপনি না বাঁচালে তাকে আত্মহত্যা করে মরতে হবে।

নিত্যকে শান্ত করে সবকিছু শোনার পর উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আপনার মেয়ের কী আমি কেউ হই না? দাদা বলে যখন ডাকেন, তখন অত ভাবার কী আছে? পুলিসে চাকরি করি বলে কী আমিও মানুষ না?

সেই দুর্যোগের রাত্রিতে দু'দেশের আইন-কানুনই অসংখ্য সরকারী নথিপত্রের মধ্যে কোথায় যে পড়ে রইল। তা কেউ জানতেও পারলেন

না। রাবেয়া দু'রাত বেনাপোলে কাটাবার পর আবার ও রংপুরের বাড়িতে ফিরে গেল।

এদিক দিয়ে রংপুরের কেউ গেলেই নিত্য ওর মেয়ের জন্য কিছু না কিছু পাঠাবেই। এবারও জয়ন্তীর সঙ্গে খুব সুন্দর একটা শাড়ি পাঠিয়েছে। সুযোগ পেলে রাবেয়াও তার নতুন আব্বা আর বড় চাচার জন্য কিছু পাঠাতে ভুলে যায় না।

সব শোনার পর আমি নিত্যকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মেয়েকে দেখতে যাও?

নিত্য ম্লান হাসি হেসে মাথা নেড়ে বলল, আমরা শুধু মানুষের আসা-যাওয়া দেখি; নিজেরা কখনও যাই না।

—সেকি! মেয়েকে দেখতেও যাওনি?

—না ভাই! নিত্য হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হাসি হেসে বলল, মেয়েকে বলেছি, নাতি কোলে করে আসতে।

নিত্য আমার আর জয়ন্তীর সামনে বসে থাকলেও মনে হলো, সে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে. আনন্দের অমরাবতীতে চলে গেছে। ঘুষখোর পুলিস অফিসার হয়েও নিত্যর চোখের কোণায় দু'ফোঁটা জল চিকচিক করছে দেখে আনন্দে খুশিতে আমার মন ভরে গেল।

পরের দিন সকালে বনগাঁ লোক্যালে চড়বার সময় নিত্য আমার কানে কানে বলল, এই ক'দিন অনেকের অনেক কিছুই তো শুনলে কিন্তু তুমি তোমাদের বিষয়ে কিছু বললে না।

ওর কথা শুনে আমার হাসি পায়। বলি, আমি আবার কী বলব?

এবার নিত্য হাসতে হাসতে একটু জোরেই বলে, দেখ বাচ্চু, সবকিছু চোখেও দেখা যায় না, কানেও শোনা যায় না কিন্তু তবু তারা ঘটে। ঘটবেই।

আমি শুধু হাসি।

ওর মুখে তখনও হাসি। বলে যায়, 'ওরে বাপু, ইচ্ছে করি না বলেই সব ক্রিমিন্যালকে ধরি না কিন্তু তার মানে এ নয় যে ক্রিমিন্যালদের আমরা চিনতে ভুল করি।

আমি কিছু বলবার আগেই জয়ন্তী জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার দাদা ?

নিত্য জবাব দেবার আগেই ট্রেনের হুইসেল বেজে ওঠে। গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করে। নিত্য ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে এগুতে এগুতে ওকে বলে, বাচ্চু সব বলবে। আর হ্যাঁ, নেমন্তন্ন করতে ভুলবেন না।

জয়ন্তী চাপা হাসি হাসতে হাসতে আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

প্রথম প্রেম

কখনো উত্তরে বাতাস, কখনো আবার দক্ষিণে বাতাস; কখনো গ্রীষ্মের দাহ, কখনো মাঘের হিম; কখনো পাতা ঝরে যায়, কখনো নতুন পাতার মহা সমারোহ। এক এক ঋতুতে এক এক রকম। কখনো পদ্মার চরে চাষীরা চাষ করে, শিশুরা খেলা করে; আবার বর্ষায় সেই পদ্মার বিভীষিকা ওদেরই রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

মানুষের মনও ঠিক একই রকম। মানুষের মনেও জোয়ার-ভাঁটা খেলে। শত বাধা-বিপত্তির উজান ঠেলে এগিয়ে যায়; আবার কখনো অতীত স্মৃতির ভাঁটার টানে ভাসতে ভাসতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলে। আজ ছবির বোধহয় এমনই একটা দিন।

অফিসের কাজে শিশিরকে এত বেশি ট্যুর করতে হয় যে একলা থাকা ছবির কাছে নতুন নয়। প্রথম প্রথম সত্যি কষ্ট হতো। খুব কষ্ট হতো। কতদিন মনের দুঃখে চোখের জল ফেলেছে। কখনো কখনো রাগে-দুঃখে কাগজ-কলম নিয়ে মাকে চিঠি লিখতে বসত—তোমরা তো সব সময় বলো, শিশিরের মত ছেলে হয় না। কিন্তু আমি যে কি দুঃখে দিন কাটাই, তা তোমরা ভাবতে পারবে না। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু'দিনও এখানে থাকে না। কোন কোন সময় পাঁচ-সাত দিনও বাইরে থাকে। দিনরাত্তির বোবা হয়ে থাকি। যে বুড়ী আমার ঘর-সংসারের সব কাজ করে, তার সঙ্গে আর কত গল্প করা যায়? দু'একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাদের তো সংসার আছে। আমার স্বামী হরদম বাইরে যান বলে তো তারা সব কাজকর্ম ফেলে আমাকে সঙ্গ দিতে পারে না।

আরো কত কি লিখত! কখনো আবার লিখত—আমাকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার জন্য তোমরা যে কেন পাগল হয়ে উঠেছিলে, তা ভেবে পাই না। আমি আরো কিছুদিন লেখাপড়া করলে বা গান

শিখলে কী তোমাদের কোন ক্ষতি হতো ? বাবার ধারণা ছিল, বিয়ের পর আমি আবার পড়াশুনা করতে পারব কিন্তু ক'টা মেয়ে বিয়ের পর লেখাপড়া করার সুযোগ পায় ? আর এই দিল্লী শহরে যে গান শিখব, তারও কোন উপায় নেই। কত গল্প-উপন্যাস পড়া যায় ? এখানে রেডিওতে কালে-ভদ্রে বাংলা গান হয়। সুতরাং রেডিওর গান শুনে যে কিছু সময় কাটাব, তারও কোন উপায় নেই।

সবশেষে ও লিখত, এক কথায় আমি চিড়িয়াখানার এক বন্দিনীর জীবন কাটাচ্ছি !

এসব অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। এখন শিশিরের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। স্বামী এখনো ট্যুরে যায়। আগে মীরাট, ডেরাডুন, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ বা জয়পুর, উদয়পুর যেতে হতো। এখন কখনো বোম্বে, কখনো মাদ্রাজ বা কলকাতা। বছরে দু'একবার বিদেশেও একলা একলা থাকতে হয়। একলা একলা মানে অবশ্য ছেলেমেয়ে কাছে থাকলেও স্বামীর সান্নিধ্য লাভ না করা। তবে ছেলেমেয়েকেই বা কতক্ষণ কাছে পায় ! ওরা দুজনেই সাতসকালে স্কুলে যায়। বেলা গড়িয়ে পড়ার পর ফিরে আসে। বিকেলে একটু খেলাধুলা, সন্ধের পর পড়াশুনা। ন'টা বাজতে না বাজতেই ঘুমে ঢুলে পড়ে। ছবির বকুনির জোরে আরো কিছু সময় বইপত্তর নিয়ে পড়ে থাকে কিন্তু সে যাই হোক, সাড়ে ন'টা-দশটার মধ্যেই দুজনে বিছানায়। এখন অবশ্য ওরা দু'জনেই বেড়াতে গেছে। ছেলের স্কুল থেকে ওদের ক্লাসের সবাইকে মানালী নিয়ে গেছে। মেয়েকে ভাশুর কলকাতা নিয়ে গেছেন। আর শিশির এক সেমিনারের জন্য ওটি গেছে।

ছেলেমেয়ে স্কুলে বা শিশির দিল্লীর বাইরে গেলে এখন ছবি সেই পুরনো দিনের মত নিঃসঙ্গতার জ্বালা বোধ করে না। দিল্লীতে এখন ওর কত বন্ধু। সীতা ওর বাবার হার্ট-অ্যাটাক হবার খবর পেয়েই কলকাতা চলে গেছে। তা নয়ত এইরকম সকাল সাড়ে ন'টা-দশটার

সময়ই ও প্রায় প্রত্যেক দিন নাচতে নাচতে এসে হাজির হয়েই বলবে. সারাদিনের মধ্যে সকালবেলার এই দু'এক ঘণ্টাই শুধু আমার নিজের। এই সময়টা যে আমার কি ভাল লাগে!

ছবি ওকে খুব ভাল করে চেনে। তাই ওর কথা শুনে ও শুধু হাসে। ছায়াদি এই পাড়াতেই থাকেন কিন্তু ছবির মত ঘনিষ্ঠ নয় বলেই সেদিন সীতার কথা শুনেই বলেন, এই দু'এক ঘণ্টা সময় ছাড়া আর কোন সময়ই তোমার ভাল লাগে না?

সীতা বলে, ভাল লাগে না মানে এই সময়টুকুর মালিক আমি নিজে। এখন আমি হাসতে পারি, কাঁদতে পারি, নাচতে পারি। ও একটু থেমে ছবির দিকে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বলে, ইচ্ছে করলে এখন আমি প্রেমও করতে পারি কিন্তু স্বামী জানতেও পারবে না, ধরতেও পারবে না। তাই এই সময়টা···

ছায়াদি ওর কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন না বলেই আবার বলেন, অন্য সময় কি তুমি ক্রীতদাসী যে তোমাকে স্বামীর কথামত উঠতে-বসতে হবে?

—হ্যাঁ, ছায়াদি, অন্য সময় সত্যি ক্রীতদাসী।

—তার মানে?

সীতা এবার কাজের ফিরিস্তি দেয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে ঠাকুর-দেবতার নাম করি আর নাই করি চায়ের কাপ নিয়ে স্বামী দেবতার নিদ্রাভঙ্গের সাধনা করতেই হবে।

ওর কথায় ওরা দুজনেই হাসেন।

—তারপর স্বামী ও পুত্ররা যতক্ষণ না বেরুচ্ছে ততক্ষণ তাদের তদবির-তদারক ভজন-পূজন করতে হবে। ছেলেরা স্কুল থেকে ফিরে এলে তাদের খাওয়া-দাওয়া থেকে এটা চাই, সেটা চাই-এর ঝামেল ভোগ করো।

এবার সীতা একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ডিরেক্টর

জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ধাতানি খেয়ে স্বামী যখন বাড়ি ফিরবেন, তখন তাকে বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডারের মত সংবর্ধনা জানাবার দায়িত্বও এই সীতাদেবীর।

ওর কথা শুনে ছায়াদি সত্যি মজা পান। তাই বলেন, তারপর?

সীতা হেসে বলে, আরো শুনতে চাও?

—হ্যাঁ, শুনতে চাই।

ও বলে যায়, শরদিন্দু বাঁড়ুজ্যের গল্প শোনার মত মন দিয়ে স্বামীর কাছে তার অফিসের গল্প শুনতে হবে। দরকার হলে বলতে হবে, এই চোপড়া আর বোস—দুটো লোকই হারামজাদা এবং বারো আনা কাজ তো তোমাকেই করতে হয় কিন্তু তবু কেন যে জি এম বা ডিরেক্টররা তোমার মুখের দিকে তাকান না, তা ভেবেই পাই না।

এবার ছায়াদি হাসতে হাসতে বলেন, মিঃ সেন খেয়ে-দেয়ে শুতে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝি তোমাকে ডিউটি দিতে হয়?

এবার সীতা মুখ টিপে না, একটু জোরেই হাসে। বলে, শুয়ে পড়ার পর প্রায়ই উনি আবিষ্কার করেন, আমার চাইতে সুন্দরী মেয়ে নাকি ভূ-ভারতে উনি দেখেননি। ব্যস! যেদিনই ঐ প্রশংসা শুনি, সেদিনই আমার সর্বনাশ!

ওর কথা শুনে শুধু ছবি না, ছায়াদিও হাসি চাপতে পারেন না।

সীতা কিন্তু ঐটুকু বলেই থামে না। বলে যায়, শুনি স্বামীদেরই সারাদিন অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু অত পরিশ্রম করার পরও যে ওরা মাঝ রাত্তিরে কি করে সার্কাস দেখায়, তা ভেবে পাই না!

এবার ছায়াদি ওকে সমর্থন না জানিয়ে পারেন না। হাসতে হাসতে বলেন, ঠিক বলেছ সীতা।

যাই হোক, এই সীতা থাকলে ছবির সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, তা ও নিজেই টের পায় না। গতকাল রেখা ফোন করে বলেছিল, কাল-পরশুর মধ্যে আসব। ছবির দুই বন্ধু দিল্লীতে আছে। শ্রীলার

স্বামী হিন্দু কলেজের লেকচারার। ওরা মডেল টাউনে থাকে। অত দূরে থাকে বলে শ্রীলা বিশেষ আসতে পারে না কিন্তু রেখা আসে এবং এলেই সারাদিন কাটিয়ে যায়। আজ এতক্ষণ যখন এলো না, মনে হয় কালই আসবে। তাই ছবি কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর নিজের আলমারিটা ঠিকমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গোছগাছ করতে বসল।

এই বাড়িতে, এই সংসারে কত কি আছে! খাট-বিছানা সোফা গার্ডেন চেয়ার থেকে শুরু করে রেডিও-টি ভি-মিউজিক সিস্টেম। কত ভাল ভাল ছবি ও বই আছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ছবি সবকিছুই ব্যবহার করে, উপভোগ করে কিন্তু ঐ সবকিছুর সঙ্গেই যেন ওর প্রাণের টান নেই। ওগুলো সবার কিন্তু এই আলমারিটা শুধু ওর নিজের। একান্তই নিজের।

বিয়ের পর ছবি যখন দিল্লীতে প্রথম সংসার করতে আসে, তখন ওদের একটা আলমারিতেই স্বামী-স্ত্রীর জামাকাপড় বা টাকা-পয়সা থাকত। চাকরিতে শিশিরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ওর জামাকাপড়ের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বাড়তে থাকে। তখন একদিন ছবি একটু অভিমান করেই বলে, তোমার জামাকাপড়ের ঠেলায় এ আলমারিতে আর আমার জামাকাপড় রাখা অসম্ভব। এতদিন বলার পরও যখন আমাকে একটা আলমারি কিনে দিলে না, তখন না হয় আমাকে মা-দিদিমার আমলের একটা স্টীলের ট্রাঙ্কই কিনে দাও কিন্তু এভাবে আর চলে না।

শিশির হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, পর পর তিন দিন আদর করলেই তোমাকে আলমারি কিনে দেব।

ছবি গম্ভীর হয়ে বলে, যে তিনশ' দিন আদর খেয়েছ সে হিসেবটা বুঝি এখন মনে পড়ছে না?

শিশির ওর মুখের পাশে মুখ নিয়ে বলে, তিনশ' তিন দিন হলেই আলমারি এসে যাবে।

ছবি প্রায় জোর করেই নিজেকে মুক্ত করে বলে, আমি আলমারিও াই না, তোমাকে আদর করতেও পারব না।

পরের শনিবারই শিশির ওকে এই আলমারিটা কিনে দেয়।

আলমারিটা যেমন সুন্দর, তেমনই বড়। ছবি নেহাৎ বেঁটে না। াধারণ বাঙালী মেয়েদের তুলনায় ও একটু লম্বাই কিন্তু তবু নিচে দাঁড়িয়ে ও আলমারির উপরের তাকে হাত পায় না। একটা ট্রল বা চেয়ারের উপর দাঁড়াতে হয়। প্রথম যখন আলমারিটা কেনা হয়, তখন অর্ধেকই খালি পড়ে থাকত কিন্তু এখন শুধু ভর্তি নয়, ঠাসাঠাসি করে কাপড়চোপড় জিনিসপত্র আছে। তাই তো এই আলমারির জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বসলেই ছবির সারাদিন লেগে যায় কিন্তু সব সময় ইচ্ছেও করে না বা হাতে অত সময় থাকে না বলেই ন'মাসে-ছ'মাসে ছবি এই আলমারি পরিষ্কার করে।

এই আলমারিতে কী নেই ? জামাকাপড়, কিছু গহনা, দু'তিনটে ঘড়ি, বাবা-মা-আত্মীয়-বন্ধুদের অসংখ্য চিঠি ও ছবি, পুরনো দিনের কিছু খাতাপত্র-ডায়েরী। লকারের একপাশে সংসারের খরচপত্রের টাকাকড়ি ছাড়াও ব্যাঙ্কের পাসবই-চেকবই। তাছাড়া কতজনের দেওয়া কত রকমের প্রেজেনটেশন। আরো কত কি!

ছবি মনে মনে ঠিক করেছিল, আগে কাপড়চোপড় না গুছিয়ে অন্য কিছুতে হাত দেবে না। এই তো ক'দিন আগে শিশিরের সঙ্গে একটা পার্টিতে যাবার সময় একটা টাঙ্গাইল সিল্কের শাড়ি বের করল কিন্তু ঐ শাড়ির সঙ্গে পরবার মত ব্লাউজটাই পেল না। খুব ইচ্ছা ছিল ঐ শাড়িটা পরার কিন্তু হলো না। অথচ তার পরের দিন সকালেই একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি টানতেই ঐ ব্লাউজটা বেরিয়ে এলো। এ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

যাই হোক, ও মেঝেতে বসে সব চাইতে নিচের তাক থেকে পুরনো সায়া আর কয়েকটি নতুন ব্লাউজ পিস টান দিতেই একটা খাতা

প্রায় কোলের উপর এসে পড়ল। খাতার মলাট ওল্টাতেই ছবি আপন মনেই একটু হাসে। প্রথম পাতায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে 'ডায়েরী'। মাস্টারমশায়েরই হাতের লেখা। খাতাটাও উনিই দিয়েছিলেন।

কবেকার কথা ?

ছবি মনে মনে একটু হিসেব-নিকেশ করে নেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করে ক্লাস ফাইভে উঠতেই একদিন সন্ধেবেলায় মাস্টারমশাই পড়াতে এসে এই খাতাটা দিয়ে বললেন, ছবি, এই খাতায় তুমি রোজ ডায়েরী লিখবে। যাদের ডায়েরী লেখার অভ্যাস থাকে, তারা সবকিছু ভাল লিখতে পারে।

তখন ছবির কত বয়স ? বড় জোর ন'দশ। না, না, দশও হয়নি। সবে ন' বছরে পা দিয়েছে। ডায়েরী সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই ছিল না। তাই তো ও মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করে, ডায়েরীতে কি লিখব ?

বৃদ্ধ সন্তোষবাবু একটু হেসে বললেন, তোমার যা ইচ্ছে তাই লিখবে।

ছবি অবাক হয়ে বলে, যা ইচ্ছে ?

—হ্যাঁ, যা ইচ্ছে। এবার উনি একটু থেমে বলেন, তুমি সারাদিনে যা করবে। তাই লিখে রেখো।

—সারাদিনে যা যা করব সব লিখে রাখব ?

—তাহলে তো খুব ভাল হয়।

ছবি একটু ভেবে আবার প্রশ্ন করে, কখন লিখব স্যার ?

—ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠেও লিখতে পারো, আবার রাত্রে শুতে যাবার আগেও লিখতে পারো। সন্তোষবাবু এক টিপ নস্যি নিয়ে বলেন, তোমার যেমন সুবিধে হবে, তেমন লিখবে। তবে একটা সময় ঠিক থাকলেই ভাল।

ছবি খাতাটা নিয়ে নাড়াচড়া করে। মাস্টারমশাই এবার বললেন, ডায়েরী লেখার সময় তারিখ লিখে রাখবে।

—কেন স্যার ?

মাস্টারমশাই একটু হেসে বলেন, পরে বুঝতে পারবে কবে কি ঘটেছে।

ছবির স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন মাস্টারমশাই চলে যাবার পরই ও ডায়েরী লিখতে বসল। আজ এত বছর পর সেই সেদিনের কচি মনের ডায়েরী পড়তে গিয়ে ছবি নিজেই হাসে। অদ্য সকাল ছ'টা আট মিনিটে শয্যা ত্যাগ করিলাম। হাত-জোড় করিয়া মা-কালীর ফটোয় প্রণাম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়িয়া বাথরুমে গেলাম…

ছবি ঐ দু'লাইন পড়েই মনে মনে বলে, এ রাম !

একসঙ্গে কয়েক পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ে—কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মকথা' কবিতাটি মুখস্থ বলিতে পারায় আমাদের বাংলার দিদিমণি খুব আনন্দিত হইলেন। উনি বলিলেন, ছবি, নববর্ষ উৎসবে তোমাকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে হইবে। দিদিমণির কথা শুনিয়া আমি খুব গৌরববোধ করিলাম।

ছবি হাসতে হাসতেই পাতা উল্টে যায় আর সেই সব দিনের কথা ভাবে। মোক্ষদা স্কুলের সব দিদিমণিরাই ভাল ছিলেন কিন্তু ওর সব চাইতে প্রিয় ছিলেন ঐ বাংলার টিচার চৈতালীদি। কী সুন্দর দেখতে ছিল চৈতালীদিকে ! উনি খুব ফর্সা ছিলেন না কিন্তু অমন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙেই যেন ওঁকে আরো বেশ ভাল লাগত। চোখ দুটো কী সুন্দর ছিল ! মনে হতো সব সময় হাসছেন। নাকটা সামান্য একটু চাপা ছিল কিন্তু মুখখানা এত সুন্দর ছিল যে ওটা চোখেই পড়ত না। তাছাড়া যেমন গড়ন, তেমন মাথায় চুল। উনি রোজই সাদা বা হালকা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আসতেন কিন্তু তবু মনে হতো ওঁর পাশে

কোন ফিল্ম স্টারও দাঁড়াতে পারবে না। বোধহয় ওঁকে খুশি করার জন্যই ছবি খুব বেশী মন দিয়ে বাংলা পড়ত।

আনমনে ঐ ডায়েরীর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই ওর আরো কত কি মনে পড়ে।

তখন বোধহয় সেভেন বা এইটে পড়ে। কী বা এমন বয়স! কিন্তু ঐ বয়সেই লিপি কি ফাজিল ছিল! রোজ টিফিনের সময় ওরা এক দল স্কুলের পিছন দিকে কোন এক গাছের ছায়ায় বসে টিফিন খেত। আর ঐ টিফিন খেতে খেতেই লিপি এক একদিন এক একজন টিচারের নানা খবর বলত।

সেদিন টিফিনের কৌটো খুলতে খুলতেই লিপি বলল, আজ চৈতালীদিকে দেখে আমারই মনে হচ্ছিল ওকে জড়িয়ে ধরে একটা কিস্ করি।

ওর কথায় অনেকেই লজ্জা পায় কিন্তু উপভোগ না করে পারে না। রেখা বলল, চৈতালীদিকে রোজই দারুণ দেখতে লাগে। ঊষা বলল, যত দিন যাচ্ছে উনি যেন তত বেশী সুন্দরী হচ্ছেন। ছবি বলল, চৈতালীদিকে দেখতেও যেমন ভাল তেমনি সুন্দর ওঁর ফিগার।

লিপি সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছিস ছবি। ওঁর বুক যেমন ডেভলপড্, থাই-টাইগুলোও দারুণ; অথচ কোমর কত সরু। ও রসগোল্লার রসে টান দেবার মত আওয়াজ করে বলল, শৈবাল ডাক্তারের কী ভাগ্য!

দু'তিনজন মেয়ে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করে, তার মানে?

লিপি রেখার কাছ থেকে একটু আচার নিয়ে মুখে দিয়েই বলল, কী আবার ব্যাপার! চৈতালীদি শৈবালকে ভালবাসে তাও তোরা জানিস না?

হাজার হোক চৈতালীর ব্যাপারে ছবির আগ্রহ সব চাইতে বেশী। তাই ও জিজ্ঞেস করে, সত্যি নাকি রে?

—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি? ও প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে যায়, এই তো পূজার ছুটি আসছে। তখন দেখিস, যেদিন ছুটি হবে সেইদিনই আপার ইণ্ডিয়ায় চৈতালীদি শান্তিনিকেতন যাবেন আর···

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কে যেন অবাক হয়ে বলে, শান্তিনিকেতন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওখানে চৈতালীদির মাসী থাকেন। লিপি মুহূর্তের জন্য একটু থেমে বলে, উনি চলে যাবার দু'একদিন পরই শৈবাল ডাক্তার কলকাতা ঘুরে শান্তিনিকেতন হাজির হবে।

লিপি কোথা থেকে কেমন করে এসব খবর জানতে পারে, তা জিজ্ঞেস করার কথাও ওদের মনে আসত না। ওরা সবাই মনে করত, লিপি সত্যি কথাই বলছে কিন্তু ঐ বয়সে যে এইসব বলতে ভাল লাগে, শুনতেও ভাল লাগে, সে কথাও ওদের কারুর মনে আসত না।

হঠাৎ দুর্গাদি এক কাপ চা ছবির পাশে রেখেই বলল, তাই বলি, আজ বৌদি কেন চায়ের জন্য তাগাদা দিচ্ছে না!

দুর্গাদির কথা শুনেই যেন ছবি সংবিৎ ফিরে পায়। হঠাৎ আবিষ্কার করে ঐ ডায়েরীর খাতাখানা হাতে নিয়েই অনেকক্ষণ বসে আছে। না, না, আর না। খাতাটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে রেখে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই নতুন ব্লাউজ পিসগুলো গুছিয়ে একপাশে রাখে।

এবার ছবি ঐ তাক থেকে সবকিছু বের করে মেঝেয় রাখে। ঠিক করে, আজেবাজে সবকিছু ফেলে দেবে। ছেঁড়া-ফাটা সায়াগুলো একে-ওকে দিয়ে দেবে। সত্যি বেশ কিছু আজেবাজে জিনিস বেরুল। কয়েকটা ছেঁড়া সায়া দূরে সরিয়ে রাখতে গিয়েই ওর ভিতর থেকেই কয়েকটা চিঠি মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। ছবি একবার ভাবে চিঠিগুলো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে। কী হবে পুরনো চিঠিপত্র জমিয়ে? তাছাড়া কত চিঠি রাখবে?

ছবির এই আলমারিতে কয়েক শ' চিঠি আছে। যখনই আলমারি

গোছগাছ করতে হাত দেয় তখনই ভাবে সব চিঠিপত্র ফেলে দেবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন চিঠিই ফেলতে পারে না। সব চিঠির সঙ্গেই কিছু সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেইসব স্মৃতির কথা মনে করে আবার চিঠিগুলো আলমারির মধ্যে রেখে দেয়। আজ সত্যি সত্যি চিঠিগুলো ছিঁড়বে বলে প্রথমে দুটো খামের চিঠি তুলে নেয় কিন্তু ছিঁড়তে চেষ্টা করেও পারল না। বড্ড শক্ত কিছু ভিতরে আছে মনে হলো। খামের ভিতর থেকে চিঠি বের করতে গিয়েই ছবি অবাক। আরে! এর মধ্যে সেই ভাগলপুরের মোক্ষদা স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ফটো আছে! ইস্! ছিঁড়ে ফেললে কী সর্বনাশ হতো? ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ ওঠার পরই ওরা কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিলে এই ছবি তুলেছিল। এই ফটো তোলার জন্য ওরা প্রত্যেকে তিন টাকা করে চাঁদা দিয়েছিল, তাও ছবির স্পষ্ট মনে আছে। এবার ছবি ফটোটার দিকে তাকাতে গিয়েই যেন ভূত দেখার মত চমকে ওঠে। যে লিপি সব সময় হাসত, সবাইকে হাসিয়ে মাতিয়ে রাখত, ভগবান তার মুখের হাসিই চিরকালের জন্য কেড়ে নিলেন? ইস্! ছবি যেন শিউরে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে ওর হাত-পা যেন অবশ হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিও যেন কেমন ঝাপসা হয়ে ওঠে। মনে পড়ে কত কথা! সেই মোক্ষদা স্কুলের কথা, টিফিনের সময় চৈতালীদির রূপ যৌবনের গল্প, সুন্দরবনে পিকনিক, ক্লাস নাইনে উঠেই চৈতালীদি আর সুমিত্রাদির সঙ্গে সারা ক্লাসের মেয়েরা মিলে মান্দার হিল যাওয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে চিত্রাঙ্গদায় অভিনয় করা ও গান গাওয়া এবং আরো কত কি মনে পড়ে।

ছবি মোক্ষদা স্কুল থেকে পাস করার পর কলকাতায় বেথুনে ভর্তি হয়। নানা কারণে ওর আর ভাগলপুর যাওয়া হতো না কিন্তু লিপির বিয়েতে গিয়েছিল। মার অমত না থাকলেও বাবার বিন্দুমাত্র মত ছিল না কিন্তু ছবির কান্নাকাটি দেখে উনি শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছিলেন।

ওর বিয়ের সময় মুঙ্গের, পাটনা, কলকাতা থেকে প্রায় সব পুরনো বন্ধুরাই ভাগলপুর হাজির হয়েছিল। হাজার হোক, লিপির বিয়ে! তার উপর লাভম্যারেজ! বন্ধুবান্ধবরা না গিয়ে পারে?

সেই অবিস্মরণীয় রাত্রির কথা ছবি কোনদিন ভুলবে না। বিয়ের পর বাসরে আসতেই লিপিকে ওরা বলল, সত্যিই তাহলে সব্যসাচীকে বিয়ে করলি?

লিপি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, এতদিন বাবা-মা'র চোখে ধুলো দিয়ে সব্যসাচীর সঙ্গে প্রেম করার পর কি তোরা ভেবেছিলি অন্য কাউকে বিয়ে করব?

ও একটু থেমে আবার বলে, আমি তো তোদের মত ভীতু না।

সেদিন কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত গান হয়েছিল, তা আজ আবার নতুন করে ছবির মনে পড়ছে। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই লিপির জীবন থেকে সব হাসি সব গান চিরদিনের মত চিরকালের জন্য কেন হারিয়ে গেল, তা ও ভেবে পায় না।

সর্বনাশ হবার কয়েক মাস পরে লিপি ছবিকে লিখেছিল, তোরা আমার জন্য দুঃখ করিস না। এ কথা ঠিক ভগবান আমাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপনেরও সুযোগ দিলেন না। তবু আমি জানি লক্ষ লক্ষ মেয়ে সারা জীবনে যে প্রেম, যে ভালবাসা, যে দরদ মমত্ব স্বামীর কাছ থেকে পায় না, ঐ ক'টি মাসের মধ্যে আমি তার চাইতে অনেক অনেক বেশী পেয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের আঘাতে-সংঘাতে আমাদের দ্বৈত জীবন কলুষিত কর্দমাক্ত হতে পারেনি। ভালবাসার স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণেই আমাদের খেলা শেষ হয়েছে, এইটুকুই সান্ত্বনা, এইটুকুই তৃপ্তি।

সব্যসাচীর মৃত্যুর বছর খানেক পর লিপির দাদারা ওর আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। যেদিন ওরা লিপিকে ওদের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন, সেদিন লিপি পাগলের মত ক্ষেপে উঠেছিল।

বলেছিল, তোমরা কী ভেবেছ আমি বেশ্যা, যে এই দেহটা যে কোন পুরুষকে বিলিয়ে দিতে পারি ?

সত্যি, বিচিত্র মেয়ে এই লিপি !

দুর্গাদি আবার এক কাপ চা দিয়ে যায়। ছবি সযত্নে ঐ ছবিটা আর লিপির চিঠিখানা লকারের মধ্যে রেখে চা খেতে খেতেই নিচের তাক গুছিয়ে ফেলে। অন্য তাক থেকে কাপড়-চোপড়গুলো টান দিতেই বড় অ্যালবামটা ওর কোলের উপর এসে পড়ল। বিয়ের অ্যালবাম ! সেই আশীর্বাদের দিন থেকে বিয়ে বৌভাত-ফুলশয্যার ছবি দিয়ে অ্যালবাম ভর্তি। ছবি ফটোগুলো না দেখে পারে না। শিশির সত্যি খুব হ্যাণ্ডসাম। ছবি আপনমনেই একটু হাসে। একটু ভাবে। সত্যি, অত তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। ভেবেছিল আরো পড়বে। ভাল করে গান শিখবে। কিন্তু তবু বিয়ের কথা শুনে মনের মধ্যে কেমন একটা চাপা আনন্দ, রোমাঞ্চ অনুভব করেছিল। ঠাকুমা বলতেন, বিয়ের কথায় কাঠের পুতুলও নাচে ! কথাটা বোধহয় ঠিক।

ছবি অ্যালবামের পাতা উল্টে যায়। শিশিরের ছবিগুলো দেখতে দেখতে মনে পড়ে ওকে দেখেই ওর ভাল লেগেছিল। যেমন সুপুরুষ দেখতে, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ ! বিয়ের পর বন্ধুবান্ধবরা বলেছিল, হ্যাঁরে ছবি, তুই কি ফ্যাশন প্যারেড করে বর পছন্দ করেছিস ?

মনের খুশি চেপে রেখে ছবি গম্ভীর হয়ে বলেছিল, ওর কী এমন রূপ দেখলি রে ?

জয়শ্রী বলল, থাক, আর ন্যাকামি করিস না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে আয় স্বামীর গর্বে তোর মুখের চেহারা কত বদলে গেছে !

এই অ্যালবামখানা নাড়াচাড়া করতে করতেই ছবির কত কথা মনে পড়ল।...

হাসিমুখে গিয়ে শিশির ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, শুনছিলাম তোমার নাকি বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না।

—বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না, তা ঠিক নয়। ভেবেছিলাম, আরো পড়াশুনা করব, গান শিখব। তারপর বিয়ে করব।

—এখন কী মনে হচ্ছে?

—ঠিক কী জানতে চাইছ?

শিশির বলে, এখন কি মনে হচ্ছে, বিয়ে হয়ে ভালই হয়েছে, নাকি বিয়ে না হলেই ভাল হতো?

ছবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে শুধু হাসে। মুখে কিছু বলে না।

রাত্রে শোবার পর ছবি ওর কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, তোমাকে দেখার পর সত্যি মত বদলে গেল। মনে হলো, বাবা-মা আমার বিয়ে দিয়ে ঠিক কাজই করেছেন।

ফটোগুলো দেখা শেষ হলে ছবি আঁচল দিয়ে অ্যালবামটা পরিষ্কার করে আলমারিতে তুলে রাখে। এবার ছবির হঠাৎ খেয়াল হয়, বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাই আর সময় নষ্ট না করে দুটো তাক পরিষ্কার করে কাপড়চোপড় সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। কতজনের কত পুরনো চিঠি হাতে পড়ে কিন্তু ওগুলো পড়তে গেলে সারাদিন কেটে যাবে ভেবে আর খুলে দেখে না। শুধু গুছিয়ে-গাছিয়ে এক তাকের কোণায় রেখে দেয়।

দুর্গাদি চায়ের কাপ-ডিশ নিতে এসে বলে, বৌদি, তোমার একটা পুরনো সায়া আমার জন্য রেখে দিও।

—কেন? নতুন সায়া তো এই সেদিন কেনা হলো!

দুর্গাদি হেসে বলে, ও দুটো তুলে রেখেছি।

—তাই বলো।

হাতের কাছেই দু'তিনটে পুরনো সায়া ছিল। ছবি সেগুলো দুর্গাদিকে দিয়ে বলল, এই নাও।

লক্ষ্ণৌ চিকনের সায়া দেখে দুর্গাদি একটু হেসে বলে, এ সায়া পরলে লোকে ঠাট্টা করবে না তো ?

ছবি একটু হেসে বলে, তুমি শাড়ির নিচে কি সায়া পরেছ, তা লোকে জানবে কী করে ?

—তবুও···

দুর্গাদি কাপ-ডিশ আর সায়াগুলো নিয়ে চলে যায়।

হ্যাঙার থেকে ময়লা শাড়িগুলো কাচতে দেবার জন্য আলাদা করে রাখতে রাখতেই টেলিফোনের বেল বাজল। ছবি তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভার তুলেই বলে, হ্যালো ! কে—রেখা ? শীলা তোর ওখানে এসেছে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে নিয়ে বিকেলে আসিস। না, না, আমি কোথাও বেরুব না।' যত তাড়াতাড়ি পারিস চলে আসিস। আমি ? আমি কি করছি ? তুই এলি না বলে আমি আলমারি গোছাতে বসেছি। কী বললি ? স্বামী আমাকে প্রেমপত্র লিখেছে কিনা ? ও জীবনে আমাকে চিঠি লিখেছে ? বড়জোর একবার টেলিফোন করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছেলের একটা পিকচার পোস্টকার্ড পেয়েছি। মেয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। কবে ফিরবে ? ভাশুরের কাছে গেলে মেয়ে আর ফিরতেই চায় না। না, না, আমি কিছু বলি না। তাছাড়া ঐ মেয়েকে নিয়ে বেড়াবেন বলে ভাশুরও তো ছুটি নিয়েছেন। আচ্ছা, ছাড়ছি। তাড়াতাড়ি আসিস।

বেশি বেলা হয়ে যাবার ভয়ে ছবি আর উপরের তাকে হাত দেয় না। ঠিক করে, শুধু লকার দুটো পরিষ্কার করেই স্নান করতে যাবে। ডান দিকের লকারটা গোছাতে বিশেষ সময় লাগল না। ওর মধ্যে সংসার খরচের টাকাকড়ি, ওর একটা গলার চেন, দুটো ঘড়ি আর টুকটাক কয়েকটা জিনিসপত্র ছিল। অন্য লকারে অসংখ্য পুরনো চিঠিপত্র, কিছু প্রেজেনটেশন পাওয়া জিনিসপত্র ছাড়াও আরো কত কি আজেবাজে জিনিস আছে। বাবা-মা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনদের

বেশ কিছু ফটোও আছে ওর মধ্যে। এই লকারটা পরিষ্কার করতে গিয়েই মুশকিল হলো। দশটা পুরনো চিঠি না পড়ে একটা বাজে কাগজ ফেলতে পারে না। একটা ফটো হাতে পড়লে আরো পাঁচটা ফটোর কথা মনে পড়ে। সেগুলো খুঁজতে গিয়ে আরো দশ-বিশটা ফটো দেখতে হয়। দেখতে ভালই লাগে। এইসব ফটো ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়েই ছবি অমিতের সঙ্গে ওর একটা ফটো দেখে আপনমনেই একটু খুশির হাসি হাসে। কত কথা, কত মিষ্টিমধুর স্মৃতি মনে আসে।···

সেদিন বিকেলে বাবা বাড়ি ফিরেই মাকে বললেন, হ্যাঁগো, ভাগলপুর টি. এন. জে. কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের অফার এসেছে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, অফার এসেছে মানে?

—আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক ত্রিদিববাবু তো এখন ওখানে প্রিন্সিপ্যাল। উনি খুব ধরেছেন···

বাবাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বললেন, উনি তো আমার ছোট কাকার খুড়শ্বশুর হন। আমাকেও উনি খুব স্নেহ করেন।

—সব জানি। আমাকেও উনি এত ভালবাসেন যে ওঁকে না বলা মুশকিল।

মা বললেন, না বলবে কেন? ওখানে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হয়ে কয়েক বছর কাটালে বরং তুমি কলকাতার কোন বড় কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হতে পারবে।

—হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

ব্যস! কয়েক মাস পরই ওরা পাটনা থেকে ভাগলপুর চলে গেলেন।

ছবির মনে আছে একদিন ওরা পাটনা ছেড়ে ভাগলপুর চলে গেল কিন্তু কেন গেল, তা জানা বা বুঝার বয়স ওর তখন হয়নি। একটু বড় হবার পর ও মার কাছে সব শোনে।

ত্রিদিববাবু যেমন পণ্ডিত তেমন স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। ছবির বাবা-মা দুজনকেই উনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ত্রিদিববাবুর মেয়েরাই বড় এবং বহুদিন আগেই তাদের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র পুত্র নেহাতই শিশু। এমন কি ছবির চাইতেও ঠিক দু'বছরের ছোট। নাম অমিতাভ। কেউ ডাকে অমি বলে, কেউ ডাকে অমিত বলে। স্বামী কলেজ আর লেখাপড়া নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকেন বলে ত্রিদিববাবুর স্ত্রী মহিলা সমিতি, হরিসভা, রামকৃষ্ণ আশ্রম বা সাহিত্য পরিষদ নিয়ে মহাব্যস্ত থাকেন। অমিত স্কুল থেকে এসে বাড়ির মধ্যেই আপন মনে পড়াশুনা বা খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকে বলে ওর আরো সুবিধে হয়েছে।

ত্রিদিববাবুর স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে ছবির মাকেও মহিলা সমিতি, হরিসভা ইত্যাদিতে ভিড়তে হয়েছে। স্বামীর মত উনিও ছবির বাবা-মাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সংসারের প্রতিটি ব্যাপারে উনি হাসিমুখে সাহায্য করেন বলে ওঁর অনুরোধ এড়ান সম্ভব নয়।

ছবির বাবা মাঝে মাঝে স্ত্রীকে ঠাট্টা করে বলতেন, তুমি তো কাকিমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে গেছ।

—কি করব বলো? উনি এত স্নেহ করেন যে ওঁকে না বলতে পারি না। একটু থেমে বলেন, তাছাড়া বাড়িতে বসে বসেই বা করব কী? কাকিমার সঙ্গে পাঁচটা কাজে বেশ সময়টা কেটে যায়।

—ছবিকে দেখছি না তো?

—এই তো ঘণ্টাখানেক আগে কাকাবাবু কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওকে নিয়ে গেলেন। আর যাবার সময় বললেন, বৌমা, ছবিয়াকে একেবারে সোমবার স্কুলে পৌঁছে দেব।

ছবির বাবা একটু হেসে বলেন, কাকাবাবু ছবিকে একদিন না দেখে থাকতে পারেন না। উনি একটু থেমে বলেন, কাকাবাবুর কাছে থাকলে ছবি অনেক কিছু শিখতে পারবে। তাছাড়া বেচারী এখানে

একলা একলা কী করবে? ওখানে তবু অমিতের সঙ্গে খেলাধুলা করতে পারে।

—তা তো বটেই!

ছবি অমিতের ঐ ফটোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবে, খঞ্জনপুরে ওদের ঐ বাড়িতে কী আনন্দেই দিনগুলো কাটত। পিছনের বাগানের ঐ লিচুতলায় ছুজনে পাশাপাশি বসে গল্প করা, আমগাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে দোল খাওয়া, ছুজনে একসঙ্গে কবিতা আবৃত্তি করা, সন্ধ্যের পর লাইব্রেরি ঘরে বসে পড়াশুনা করা, ছু'জনে এক রিকশায় চেপে স্কুলে যাওয়া-আসা, আরো কত কি!

বড় ঘরের ঐ বিরাট খাটের একধারে শুতেন দিদি—ত্রিদিববাবুর স্ত্রী আর অন্য ধারে শুতো ছবি; মাঝখানে অমিত। দিদি শোবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়লেও ওদের ছুজনের চোখে ঘুম আসত না। ছুজনে গলা জড়াজড়ি করে কত কথা, কত গল্প।

—আচ্ছা ছবি, তুই কাঠবেড়ালী ধরতে পারবি?

—কেন? তুই পুষবি?

—হ্যাঁ।

ছবি সঙ্গে সঙ্গে বলে, ঠিক আছে, একটা কাঠবেড়ালী ধরে দেব। এই কথা বলেই ও প্রশ্ন করে, কিন্তু কাঠবেড়ালীকে কি খেতে দিবি?

সাত বছরের শিশু অমিত বলে, ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ, মাংস··

ন'বছরের পাকা গিন্নী ছবি বলে, তুই একেবারেই বাচ্চা! কিচ্ছু জানিস না। ওরা তো রামচন্দ্রের ভক্ত। মাছ-মাংস খায় না।

—ভাত, ডাল, তরকারি তো খাবে?

ছবি স্পষ্ট জবাব দেয়, না, ওরা শুধু ছুধ আর ফল খায়।

—আমিও ছুধ ফল খেতে দেব।

—তাহলে ঠিক আছে।

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপ করে থাকে। তারপর ছবি ওকে জিজ্ঞেস করে, কাঠবেড়ালীকে কোথায় শুতে দিবি ?

—আমাদের দুজনের মাঝখানে ওকে শুতে দেব।

—না, না, আমরা দুজনে এইভাবেই শোব। কাঠবেড়ালীকে একটা নতুন বিছানা করে দেব।

—ও একলা একলা শুতে ভয় পাবে না ?

—ভয় পাবে কেন ? ওরা তো বনের মধ্যে একলা একলাই থাকে।

একটু ভেবে অমিত জিজ্ঞেস করে, কাঠবেড়ালীদের বাবা-মা থাকে ?

—কেন থাকবে না ?

—ওরা কোথায় থাকে ?

—ওরাও আলাদা আলাদা থাকে।

ঐ কাঠবেড়ালী নিয়ে কথা বলতে বলতেই রাত গভীর হয়। পিছনের বাগানে কি একটা পাখি বিকট চিৎকার করতেই অমিত ভয়ে ছবিকে আঁকড়ে ধরে। ছবিও ওকে আরো কাছে টেনে নেয়। বলে, ভয় কী ? আমি তো আছি !

এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটে। বছরও পার হয়। নতুন ক্যালেণ্ডার আবার পুরনো হয়।

সাতসকালে ত্রিদিববাবু সামনের দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে হাঁক দেন, ছবিয়া, এই ছবিয়া !

শুধু ছবি না, ওর বাবা-মাও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসেন।··

কী ব্যাপার কাকাবাবু, এই ভোরবেলায় ছবির খোঁজে এসেছেন ? স্বামী-স্ত্রী প্রায় একই সঙ্গে জানতে চান।

ত্রিদিববাবু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই হাসতে হাসতে বলেন, ছবিয়াকে

আমার হাজার কাজে দরকার। এবার উনি ছবিকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, গ্যাখ ছবিয়া, সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক উৎসবে তোকে রবি ঠাকুরের 'পৃথিবী' কবিতাটা আবৃত্তি করতে হবে।

ছবি একটু হেসে বলে, ওটা খুব বড় কবিতা, তাই না দাদু ?

—কবিতাটা বড় ঠিকই কিন্তু তুই তো বড় হয়েছিস। ত্রিদিববাবু ওর মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, এখন তুই আর কচি খুকী না, ক্লাস সিক্স-এ পড়িস। আরো কত বড় বড় কবিতা তোকে আবৃত্তি করতে হবে।

ছবি শুধু হাসে। কোন কথা বলে না।

ত্রিদিববাবুই আবার বলেন, বুঝলি ছবিয়া, রবি ঠাকুর তো শুধু কবি ছিলেন না, তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, ঐতিহাসিক ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন। উনি একটু থেমে হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথ সবকিছু ছিলেন। এই 'পৃথিবী' কবিতাটা ভাল করে বুঝলে লক্ষ কোটি বছরের ইতিহাস জানাও হবে, বিজ্ঞান জানাও হবে।

চা-টা খেতে খেতে ছবির বাবা-মার সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা বলার পর বিদায় নেবার আগে ত্রিদিববাবু বলেন, ছবিয়া আজ স্কুল থেকে সোজা আমাদের ওখানে চলে যাবে আর কয়েক দিন ওখান থেকেই স্কুলে যাতায়াত করবে।

পড়াশুনা খেলাধুলার মাঝখানে একটু একটু করে 'পৃথিবী' কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করার কাজ এগিয়ে চলে। ছবি হঠাৎ প্রশ্ন করে, আচ্ছা দাদু, অমিত কোন কবিতা আবৃত্তি করবে না ?

ত্রিদিববাবু মাথা নেড়ে বলেন, অমির দ্বারা এসব হবে না। এখনও খুবই ছোট, তবু মনে হয়, ও অঙ্কে ভাল হবে।

—কিন্তু অনেক কবিতা তো ও মুখস্থ বলে।

—তা বলে কিন্তু কবিতা-টবিতার চাইতে অঙ্ক করেই ও বেশি আনন্দ পায় বলে মনে হয়।

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেই অমিত ডাক দেয়, এই ছবি, শোন।

ছবি এগিয়ে এসে বলে, কী বলছিস ?

—আগে চোখ বন্ধ কর।

—চোখ বন্ধ করব কেন ?

—দরকার আছে।

ছবি চোখ বন্ধ করতেই অমিত বলে, হাঁ কর।

ছবি কোন প্রশ্ন না করেই হাঁ করে। এবার অমিত ওর মুখের মধ্যে একটা টফি দিয়েই বলে, কেমন ? ভাল না ?

ছবি চোখ খুলেই হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কোথায় পেলি রে ?

অমিত নিজের মুখের মধ্যে একটা টফি দিয়ে বলে, পরশু এক বন্ধু দিয়েছিল।

ছবি অবাক হয়ে বলে, পরশু দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—পরশু দিয়েছিল আর আজ খাচ্ছিস ?

—তোকে না দিয়ে আমি কিছু খাই ?

ছবি অমিতকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, তাই না ?

অমিত মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ। এবার ও প্রশ্ন করে, তুই আমাকে ভালবাসিস ?

ছবি ওকে খুব জোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে, হ্যাঁ, আমিও তোকে খুব ভালবাসি।

কত দিন আগেকার কথা কিন্তু সবকিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট মনের পর্দায় ভেসে উঠছে ছবির। কোন কিছু ভোলেনি। ভুলতে পারে না। অসম্ভব।

ছবি অমিতের ফটোটা তখনও হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটু হাসে।

—তুই কি বড় হয়েছিস যে শাড়ি পরতে শুরু করলি ?

ছবি বলে, আমাদের স্কুলের নিয়ম ক্লাস সেভেন থেকে শাড়ি পরতে হবে।

ও একবার অমিতের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, তাছাড়া আমি বুঝি বড় হচ্ছি না ?

দশ বছরের অমিত একটু চিন্তা ভাবনা করে বলে, স্কুলে না হয় শাড়ি পরে গিয়েছিস কিন্তু এখন শাড়ি পরে শুয়েছিস কেন ?

—কাল তো আমি এই শাড়ি পরে স্কুলে যাব না। ছবি ওর মুখের পর একটা হাত রেখে বলে, তাছাড়া আমার শাড়ি পরতে ভালই লাগে।

অমিত একটু হেসে বলে, তুই শাড়ি পরলে খুব সুন্দর দেখতে লাগে।

—সত্যি বলছিস ?

—এই তোকে ছুঁয়ে বলছি। অমিত ওর বুকে একবার হাত দিয়েই বলে।

এত বছর পর সেসব রাত্রির কথা ভাবতে গিয়েও যেন ছবি একটু লজ্জা পায়। পাবেই তো ! এখন যে এ দেহে কামনা-বাসনা-লালসা পাকাপাকি আসন বিছিয়ে বসেছে কিন্তু তখন কিশোরী মন-এ তো ওরা ঠাঁই পায়নি। আগের মতই ছবি ওকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে, মনের কথা বলে, শোনে।

—আচ্ছা অমিত, তুই বড় হয়ে কী হবি ?

—আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো।

—তোর ডাক্তার হতে ইচ্ছে করে না ?

—না।

—কেন ?

—হাসপাতালের চাইতে কলকারখানা ল্যাবরেটরি আমার অনেক ভাল লাগে।

ছবি ওর মাথায়, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, তুই খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার হবি, বুঝলি ?

—আমি বড় ইঞ্জিনিয়ার হলে তোর ভাল লাগবে ?

—হ্যাঁ, খুব ভাল লাগবে।

অমিত একটু ভেবে প্রশ্ন করে, তখনও তুই আমার কাছে শুয়ে শুয়ে এই রকম গল্প করবি ?

—দূর বোকা ! তখন তো আমার বিয়ে হয়ে যাবে।

—তখন তুই বরের কাছে শুবি ?

—হ্যাঁ।

—রোজ বরের কাছে শুবি ? একদিনও আমার কাছে শুবি না ?

—বিয়ের পর বর আমাকে তোর কাছে শুতে দেবে কেন ?

—তোর বর বুঝি রাগী লোক হবে ?

ছবি ঠোঁট উল্টে বলে, ভগবান জানেন ! একটু পরই ও বলে, ততদিন তো তোরও বিয়ে হবে।

—সত্যি ?

—বড় হলে তো সবারই বিয়ে হয়।

—আমার বউ আমার কাছে শোবে ?

—তোর কাছেই তো শোবে।

অমিত আবার একটু ভাবে। তারপর বলে, তোর মত গলা জড়িয়ে শোবে ?

—তুই বললেই শোবে।

—আমি কি তোকে গলা জড়িয়ে শুতে বলি ?

—আমার ভাল লাগে বলেই আমি তোকে জড়িয়ে শুই। কেন, তোর কি ভাল লাগে না ?

—তোকে জড়িয়ে শুতে আমারও ভাল লাগে।

গ্রীষ্ম-বর্ষা শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্তর চাকা ঘুরে চলে। অমিতের শৈশব বিদায় নেয়, শূন্য আসন পূর্ণ করে কৈশোরের ক্ষুদে রাজা। ছবিও এগিয়ে চলে। বসন্তরাজ যৌবন-এর আগমনী বার্তা অস্পৃষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। তা হোক। দুটি মন, দুটি আত্মা সেই একই সুরে বাঁধা থাকে।

—এই ছবি, ছবি! টিফিনের সময় দূর থেকে চিৎকার করে শ্রীলা ডাকে।

ছবি ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে শ্রীলাকে দেখে ওর কাছে যায়। জিজ্ঞেস করে, ডাকছিস কেন?

—অমিত কতক্ষণ গেটের কাছে তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ছবি তাড়াতাড়ি মেন গেটের কাছে গিয়ে দেখে সাইকেলে হেলান দিয়ে অমিত দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখেই অমিত বলল, তোকে ডেকে দেবার জন্য কতজনকে বলেছি।

তুই অনেকক্ষণ এসেছিস?

টিফিনের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সাইকেলে চেপেছি।

—ইস্! তোকে কত কষ্ট দিলাম!

অমিত একটা ক্যাডবেরি চকোলেট ওর হাতে দিয়ে বলল, এই নে। আমি চলি।

ছবি একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় বলে, তুই খুব ভাল ছেলে!

অমিত ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। ও আর দেরি করে না। সাইকেলে উঠেই খুব জোরে প্যাডেল করে।

ছবি বিমুগ্ধ মনে ঐখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমিতকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে।

অমিতের সি-এম-এস স্কুল থেকে ছবির মোক্ষদা স্কুল বেশ খানিকটা দূরে। ওটা আদমপুরে, এটা মসাকচকে। তবু ভাল-মন্দ কিছু পেলেই অমিত টিফিনের সময় ছুটে আসে। বরাবর। ছবিরও মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে টিফিনের সময় ওকে কিছু দিতে কিন্তু যাবে কি করে? টিফিনের সময় তো বেরুবার নিয়ম নেই। নিয়ম থাকলেও যেতে পারত না। ও তো সাইকেল চালাতে জানে না! হেঁটে সি-এম-এস স্কুল যাতায়াত করতে না করতেই তো টিফিনের ঘণ্টা পড়ে যাবে। তবে টিফিনের সময় স্কুলে গিয়ে কিছু দিতে না পারলেও ছবি মাঝে মাঝে ওকে কিছু না দিয়ে পারে না। দিতে ইচ্ছে করে; দিলে ভাল লাগে।

—এই অমিত, একটু লিচুতলায় চল।

—কেন রে?

—চল না! একটু দরকার আছে।

ছবির পিছন পিছন অমিত লিচুগাছের পাশে গিয়েই বলে, বল, কি দরকার?

ছবি আঁচলের আড়াল থেকে একটা সরু লম্বা প্যাকেট বের করে ওকে দিয়ে বলল, এই নে।

—এটা কী?

—খুলেই গ্যাখ।

অমিত খুলে দেখে একটা ফাউন্টেন পেন। ও একটু অবাক হয়েই বলে, হঠাৎ ফাউন্টেন পেন দিচ্ছিস কেন?

—আমার বুঝি দিতে ইচ্ছে করে না?

—তাই বলে এত ভাল পেন দিবি?

ছবি স্পষ্ট জবাব দেয়, আমার অনেক টাকা থাকলে আরো অনেক দামী পেন দিতাম।

হঠাৎ দুর্গাদি ঘরে ঢুকেই চিৎকার করে বলল, কিগো বৌদি, তুমি কি বাথরুমে যাবে না? নাকি খাওয়া-দাওয়া করবে না?

ছবি বিভোর হয়ে যে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিল, সেখান থেকে বাধ্য হয়ে মাটির পৃথিবীতে নামতেই হয়। বলে, হ্যাঁ, এখনি উঠছি।

প্রায় সবকিছু আগের মতই লকারের মধ্যে ভরে দেয়, শুধু অমিতের ফটোটা ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের মধ্যে আলাদা করে রাখে। এবার ছবি তাড়াতাড়ি আলমারি বন্ধ করে বাথরুমে ঢোকে।

খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে নিতেও ছবি শুধু অমিতের কথা ভাবে। না ভেবে পারে না। অন্য কিছু ভাবতে মন চাইছে না।

ভাগলপুর থেকে চলে আসার আগের দু'চারটে দিনের কথা ভাবতে গেলে এখনো ছবির চোখে জল এসে যায়। ত্রিদিববাবু ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বললেন, তোর বাবা যখন কলকাতায় ভাল চান্স পেয়েছে, তখন তোকে তো যেতেই হবে। তাছাড়া তুইও ওখানে গিয়ে ব্রেবোর্ন বা বেথুনে পড়তে পারবি কিন্তু তোকে ছাড়তে ঠিক মন চায় না।

ছবি পাথরের মত মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। পাশেই অমিত দাঁড়িয়ে।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝলি ছবিয়া, তুই যদি একটু ছোট হতিস বা অমি যদি একটু বড় হতো, তাহলে বড় ভাল হতো।

ছবি আর পারে না। দু'চোখ জলে ভরে যায়। কয়েক মুহূর্ত কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। তারপর হঠাৎ ছবি পাগলের মত এক দৌড়ে লিচুতলায় গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ে দু'হাঁটুর উপর মাথা রেখে চোখের জল ফেলে।

একটু পরেই অমিত এসে ওর মাথায় হাত দিতে দিতে বলে, এই ছবি, কাঁদছিস কেন? দু'বছর পর আমিও তো কলকাতার কলেজে পড়ব। তাছাড়া এর মধ্যে তুইও এখানে আসবি, আমিও ছুটিতে তোর কাছে যাব।

ছবি কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তুলে বলে, সত্যি তুই আসবি ?

—নিশ্চয়ই আসব।

—ঠিক বলছিস তো ?

—আমি কি কোনদিন তোকে মিথ্যে কথা বলেছি ?

ছবি মাথা নেড়ে বলে, না।

—তবে ?

—তুই পুরো ছুটিটা আমাদের কাছে থাকবি তো ?

—পড়াশুনার ক্ষতি না হলে নিশ্চয়ই থাকব। অমিত জোর করেই নিজের মুখে একটু হাসি ফোটায়। বলে, একবার তুই আসবি, অনেকবার আমি যাব।

ছবি যা যা খেতে ভালবাসে, ত্রিদিববাবু আজ বাজার থেকে সেই সবই এনেছেন। স্ত্রীকে বলেছেন, খুব ভাল করে রান্না করবে। আমার ছবিয়াকে আবার কবে খাওয়াতে পারব তার তো ঠিক নেই।

বৃদ্ধা একটু মুচকি হেসে বললেন, তুমি এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ যেন ছবিকে শুধু তুমিই ভালবাস, আর কেউ ভালবাসে না।

—না, না, তা ভাবব কেন ?

সেদিন রাত্রে এই বুড়ো-বুড়ীর পাল্লায় পড়ে কত কি ও কত বেশি খেতে হলো। তারপর কতক্ষণ ধরে সবাই মিলে গল্প হলো। দু'তিনবার হাই তোলার পরই ত্রিদিববাবু বললেন, ছবিয়া, বড্ড ঘুম পেয়েছে, শুতে যাচ্ছি। আবার কাল গল্প হবে।

একটু পরে ওঁর স্ত্রী বললেন, আমারও বড্ড ঘুম পেয়েছে। তোরাও আর দেরি করিস না।

অমিত বলল, তুমি শোও। আমরাও একটু পরে আসছি। হ্যাঁ, একটু পরে ওরাও শুতে আসে। সেই আগের মতই বড় খাটে তিনজনের বিছানা। আগের মতই অমিত আর ছবি পাশাপাশি

মুখোমুখি শুয়ে গল্প করে কিন্তু এখন আর আগের মত দুজনে দুজনকে জড়িয়ে শোয় না। বোধহয় দু'জনেরই লজ্জা করে। হাজার হোক, ছবির তো বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। অমিতেরও গোঁফের রেখা বেরিয়েছে, হাফপ্যান্ট পরা বছর দুই আগেই ছেড়ে দিয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনই মানুষের পায়ে অনুশাসনের শিকল পরিয়ে দেয়।

অনেক কথার পর ছবি জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা অমিত. তুই আমাকে ভুলে যাবি না ?

—কোনদিন না।

—যখন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার হবি, তখনও ভুলবি না ?

—না।

ছবি একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, যখন তোর বিয়ে হবে, খুব সুন্দর বউ আসবে, তখনও ভুলবি না ?

অমিত স্পষ্ট জবাব দেয়, না। একটু থেমে ও প্রশ্ন করে, তুই কি বর পেয়ে আমাকে ভুলে যাবি ?

—মেয়েরা অত সহজে কোন কিছুই ভোলে না।

কথায় কথায় রাত গড়িয়ে যায় তারপর এক সময় দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরবেলায় ছবির ঘুম ভেঙে যায়। অমিত ওর গায়ের উপর একটা পা তুলে আর হাত বুকের উপর দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ যেন ছবি লজ্জায় দ্বিধায় কুঁকড়ে যায়। না, দিদিও ঘুমুচ্ছেন। লজ্জা কেটে যায় কিন্তু শিহরণ অনুভব করে সারা শরীরে, মনে। ছবি অমিতকে দেখে, প্রাণভরে দেখে, মুগ্ধ হয়ে দেখে। কী একটা চাপা ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু অজানা অজ্ঞাত অনুশাসনের জন্য সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। পারে না। সঙ্কোচ হয়। একটু যেন ভয় ভয় করে। ছবি ওর বুকের উপর থেকে অমিতের হাত সরিয়ে দিতে গিয়েও সরিয়ে দেয় না। পারে ন।। মায়া হয়। নাকি

এক অনাস্বাদিত আনন্দের স্বাদ পেয়ে ওর বসন্তোৎসবের উদ্বোধন হয় ?

এত বছর স্বামীর উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগের পর আজ সেই ফেলে আসা দিনের এক টুকরো স্মৃতির কথা মনে করে ছবি যেন লজ্জায় লাল হয়ে যায়। কিন্তু অমিত ? ও কি সেই আনন্দ-স্মৃতির কথা জানে ?

ছবির বিয়েতে অমিত আসতে পারেনি। বছর দুয়েক পর এক আত্মীয়ার বিয়েতে হঠাৎ দুজনের দেখা। তাও সিঁড়িতে ওঠা-নামার সময়। দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। দুজনেই দুজনকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে বেশ কিছুক্ষণ। তারপর দুজনেই হঠাৎ একসঙ্গে হাসে। দুজনেই বোধহয় একসঙ্গে প্রশ্ন করেছিল, কেমন আছ ?

এ প্রশ্নের জবাব কেউই দেয়নি। দুজনেই শুধু একটু হেসেছিল।

—তোমার বরের সঙ্গে আলাপ হলো। অমিত ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল ?

অমিত একটু হেসে বলল, তোমার মত সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ের উপযুক্তই বটে।

ছবি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলে, আমি এখন দিল্লী থাকি, তা জানো ?

—জানি।

—একবার এসো না !

—সত্যি আসব ?

—তবে কি ঠাট্টা বলছি ?

—কোন অসুবিধে হবে না ?

—বিন্দুমাত্র না, বরং অত্যন্ত খুশি হবো।

অমিত একটু মুচকি হেসে প্রশ্ন করল, সত্যি খুশি হবে ?

—একশ' বার খুশি হবো। ছবি একটু হেসে বলে তোমার মত আমিও মিথ্যে কথা বলি না।

—জানি।

একে বিয়েবাড়ি, তার উপর সিঁড়িতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। পাশ দিয়ে লোকজনের যাতায়াতের বিরাম নেই। তবু এরই মধ্যে একটু সুযোগ বুঝে ছবি বলে, তুমি ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ জেনে খুব খুশি হয়েছি।

অমিত একটু হেসে বলে, কী করব বলো ? ঐ লিচুতলায় বসে বা আমগাছের দোলনায় দোল খেতে খেতে এমন একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে কিছুতেই পড়াশুনায় ফাঁকি দিতে পারি না।

কথাটা শুনেই ছবি মুখ নিচু করে। কৃতজ্ঞতায় ওর সারা মন ভরে যায়। নাকি গর্ব হয় ? ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এ কথাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে, এ সংসারে ভালবাসার আদুরে গোলাপ-চারা সব মানুষের মনেই জন্ম নেয় কিন্তু সংসারের শত নির্মমতার মধ্যেও পুরুষ তাকে মন-প্রাণের সার-জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। রাখবেই। আর মেয়েরা ? নতুন জীবনের উন্মাদনার ঘোরে সে প্রথম জীবনের ঐ ভালবাসার গোলাপ-চারার কথা ভুলে যায়। মুছে ফেলে সে স্মৃতি।

ছবি মনে মনে একটু অস্বস্তিবোধ করলেও নিজেকে সামলে নেয়। ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, ফাঁকি দিলেই হলো ? বকুনি খাবার ভয় নেই বুঝি ?

অমিত হাসতে হাসতে উপরে উঠে যায়।

ছবি ভাঁটার টানে ভাসতে ভাসতে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু হাসি বার বার মনে পড়ে। কিন্তু তিল দিয়েই তাল, খণ্ড দিয়েই তো অখণ্ড। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ঐ বিয়েবাড়িতে দেখা হবার বহুকাল পর মাদ্রাজে আবার ওদের দেখা হয়। শিশির অফিসের কাজেই গিয়েছিল। মাদ্রাজ দেখেনি বলে ছবিও ওর সঙ্গে গিয়েছিল। ভেবেছিল অমিতকে আগেই চিঠি লিখে জানাবে কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। ওখানে গিয়েই শিশির ফোন করল—মে আই টক টু প্রফেসর ডক্টর ব্যানার্জী?

—জাস্ট এ মিনিট স্যার।

কয়েক মুহূর্ত পরই ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন, স্পীক অন স্যার!

—অমিতাভ ব্যানার্জী!

—আমি শিশির। ছবি আর আমি কাল রাত্রে এসেছি।

অমিত হাসতে হাসতেই বলে, রিয়েলি?

—তবে কি আমি দিল্লী থেকে ফোন করছি?

—না, না, তা বলছি না। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের ধাক্কা সামলাতে একটু কষ্ট হয় তো! এবার অমিত এক নিঃশ্বাসে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে, কোথায় উঠেছেন, ক'দিন থাকবেন, এখানে কাজে না বেড়াতে এসেছেন, ছেলেমেয়েকে এনেছেন কিনা, আরো কত কি!

শিশির একটু হেসে বলে, সবার আগে তোমার সৌভাগ্যের ধাক্কা সামলাবার জবাব দিই।

—হ্যাঁ, দিন।

—তুমি তো ভাই জীবনে বহু সৌভাগ্য লাভ করেছ; সুতরাং তোমার তো এই সামান্য খবরে—

ওকে পুরো কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অমিত বলল, বিলেত-আমেরিকার ইউনিভার্সিটি থেকে দু'একটা ডক্টরেট পাওয়া কোন ব্যাপারই না। ও বহুজনে পায় কিন্তু···

—তা তো বটেই!

—কিন্তু এই মাদ্রাজ শহরে হঠাৎ আপনাদের দুজনকে পাওয়া সত্যি সৌভাগ্যের ব্যাপার !

যাই হোক, শিশির এবার বলে, আমি অফিসের কাজেই এসেছি। থাকব শুক্রবার পর্যন্ত। তবে ছবি মাদ্রাজ দেখেনি বলে প্রায় জোর করেই এলো।

—জোর করে এলো মানে ?

—আমি তো কনফারেন্স নিয়েই ব্যস্ত থাকব। তাই ওকে বলেছিলাম, আমি তো তোমাকে নিয়ে বেড়াবার সময় পাব না।

—তারপর ?

—ছবি বলল, অমিত তো আছে। দরকার হলে ওকে দু'দিন ছুটি নিতে বলব।

অমিত বলল, দ্যাট'স নো প্রবলেম কিন্তু আপনি কনফারেন্স শেষ করেই পালাতে পারবেন না।

—কিন্তু···

—আই টেল ইউ শিশিরদা, কোন কিন্তু বিজনেস চলবে না।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। ইন এনি কেস, ইউ রিং আপ কনিমারা রুম নাম্বার ফোর-ফোর-টু। আই উইল ট্রাই টু সী ইউ লেট ইভনিং।

শিশির বেরুবার সময় বলে গেল, অফিসে গিয়েই অমিতের সঙ্গে যোগাযোগ করে হোটেলে ফোন করতে বলবে। এতক্ষণ ফোন না আসায় ছবি যেন একটু আশাহত হয়। একটু অবাকও হয়। শিশির কি অমিতকে পায়নি ? ও আবার বিলেত আমেরিকায় কোন বক্তৃতা দিতে গিয়েছে নাকি ? অথবা ··

মন ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু তবু একবার মুহূর্তের জন্য ভয় হয়, অমিত বদলে যায়নি তো ? জীবনে এত উন্নতি করার পরও সেই লিচুতলার স্মৃতি ··

দরজার ওপাশ থেকে বোধ'হয় রুম-বেয়ারা বেল বাজাল। ছবি একটু বিরক্ত হয়েই বলল, কাম ইন।

দরজা খুলে অমিতকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ছবি যেন ভূত দেখার মত অবাক হয়ে বলে, তুমি !

অমিত দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে দু'এক পা এগিয়েই বলল, তুমি কি ভেবেছিলে ? রুম-বেয়ারা নাকি···

—সত্যি তাই ভেবেছিলাম। আনন্দে খুশিতে ছবির সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, আমি তো স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি এভাবে এখুনি এসে হাজির হবে, বরং ··

অমিত বড় সোফার একপাশে বসতে বসতে বলে, বরং কি ?

ছবি ঐ সোফারই অন্য দিকে ওর মুখোমুখি বসে বলে, সত্যি ভয় হচ্ছিল, হয়ত তুমি বদলে গেছ, হয়ত পুরনো দিনের কোন কিছুই এখন মনে করতে চাও না বা ··

অমিতের মুখের হাসি দেখে ছবি থামে।

অমিত বলে, থামলে কেন ? বলে যাও। শুনতে বেশ লাগছে।

ছবি দু'চোখ ভরে ওকে দেখতে দেখতে বলে, যাক, বলো, কেমন আছ ?

অমিত কষ্ট করেও হাসি চাপতে পারে না। বলে, কনিমারা হোটেলের রুম নাম্বার ফোর-ফোর-টু'তে ছবির সামনে বসে খুব ভাল আছি।

—বাঃ ! বেশ কথা বলো তো আজকাল ! ছবি একটু থেমে বলে, হরদম বিলেত-আমেরিকায় গিয়ে মেমসাহেবদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতেই বোধহয় ·

—খুব অধঃপাতে গিয়েছ, তাই তো ?

—ছি, ছি, ওকথা বলো না। সবাই তোমার জন্য কত গর্ব অনুভব করে।

—তুমি ?

ছবি দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, না, আমি গর্ব অনুভব করি না কিন্তু ··

অমিত একটু অবাক হয়ে জানতে চায়, তুমি গর্ব অনুভব করো না ?

—না। চাঁপাগাছে চাঁপাফুলই ফুটবে বা ল্যাংড়াগাছে ল্যাংড়াআমই হবে। তুমি যে ভাল হবে, বড় হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

ওর কথা শুনে আনন্দে খুশিতে অমিতের মনপ্রাণ ভরে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনের কেউই কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে দুজনের দৃষ্টি মাঝ পথে বিনিময় হয়। অকারণে দুজনেই একটু হাসে।

—ভাগলপুর যাও ?

—বছরে একবার ছুটি নিয়েই যাই। তাছাড়া সেমিনার-কনফারেন্সে কলকাতা-পাটনা-গৌহাটি গেলেও অনেক সময় একটা চক্কর দিয়ে আসি।

—দাদু-দিদি তো ওখানেই থাকেন ?

—বছরের অর্ধেক সময় ওখানেই থাকেন। বাকি সময় কখনো আমাদের কাছে, কখনো দিদিদের কাছে কাটান।

ছবি আবার জানতে চায়, সব আগের মতই আছে ?

অমিত মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

—সেই লিচুগাছ, আম-পেয়ারার গাছগুলোও আছে ?

ও একটু হেসে বলে, হ্যাঁ।

আবার ক্ষণিকের নীরবতা। মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময়। সলজ্জ হাসি।

অমিত জিজ্ঞেস করে, তোমার ভাগলপুর যেতে ইচ্ছে করে না ?

ছবি আপনমনে কি যেন ভাবে। বোধহয় ওর কথা শুনতে পায় না। জিজ্ঞেস করে, দোলনাটা এখনও আছে ?

অমিত হেসে বলে, আমি তো এখনও গিয়ে দোলনায় চড়ি।

—ইস্! তোমার কি মজা! ছবি দৃষ্টিটা একবার দূরের মুক্ত আকাশের দিকে ছড়িয়ে দিয়েই প্রশ্ন করে, বাগানে এখনও কাঠবেড়ালীগুলো দৌড়াদৌড়ি করে?

হঠাৎ খুব জোরে বেল বাজাতেই ছবি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। দরজা খুলতেই রেখা আর শ্রীলা প্রায় একসঙ্গে হাসতে হাসতে বলে, এতক্ষণ ধরে বেল বাজাচ্ছি, শুনতেই পাসনি?

ছবি হেসে বলে, সত্যি শুনতে পাইনি।

রেখা ড্রইংরুমে পা দিয়েই হাসতে হাসতে বলে, জেগে জেগে কি স্বামীকে স্বপ্ন দেখছিলি?

—এত বছর বিয়ের পর কি কেউ স্বামীকে স্বপ্ন দেখে?

শ্রীলা বলে, তবে কি প্রথম প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করছিলি?

ছবি হোহো করে হাসতে হাসতে বলে, ঠিক ধরেছিস!